মে ২০০৫। ১০ টাকা

সন্দেশ

সম্পাদক
সন্দীপ রায় • সুজয় সোম

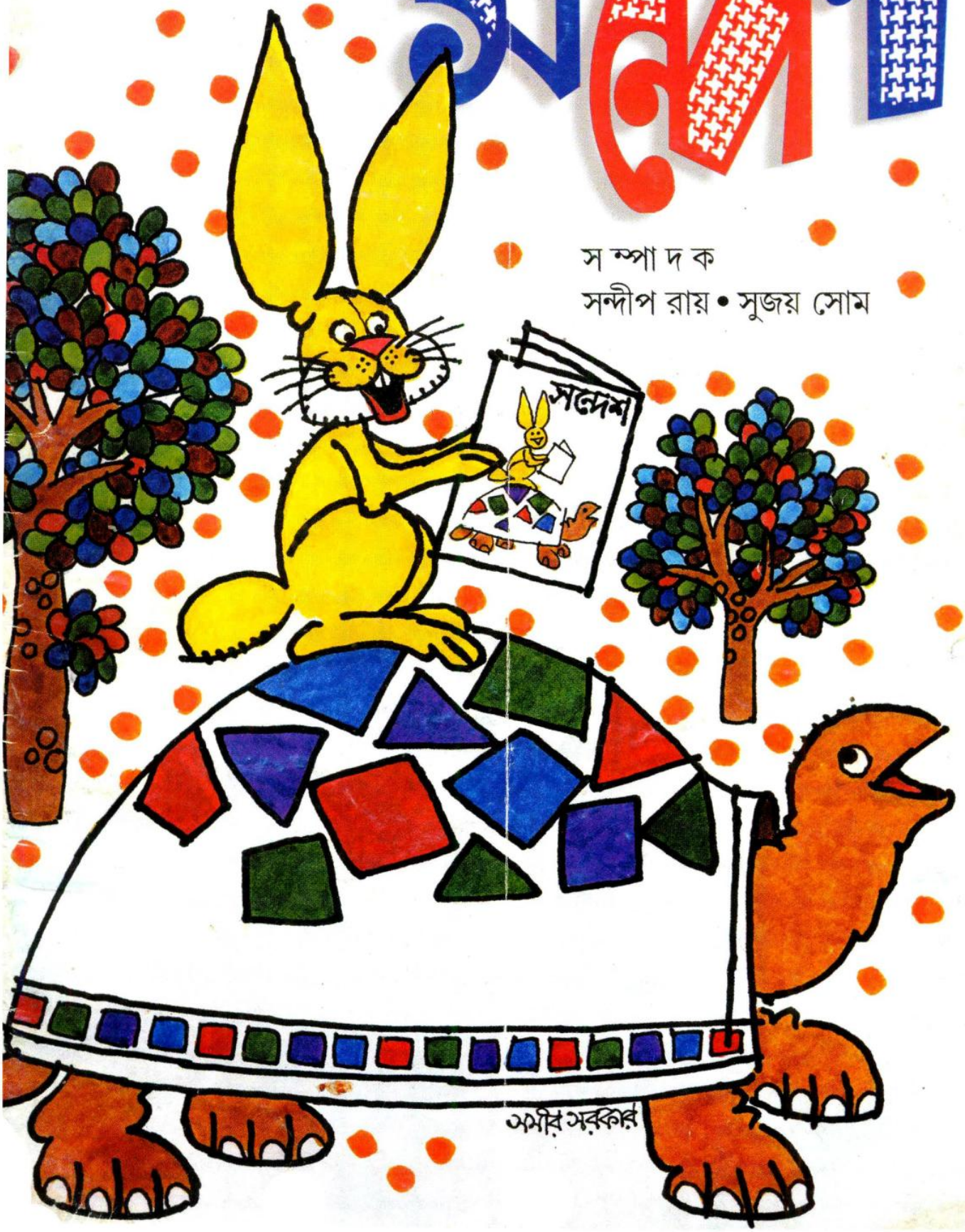

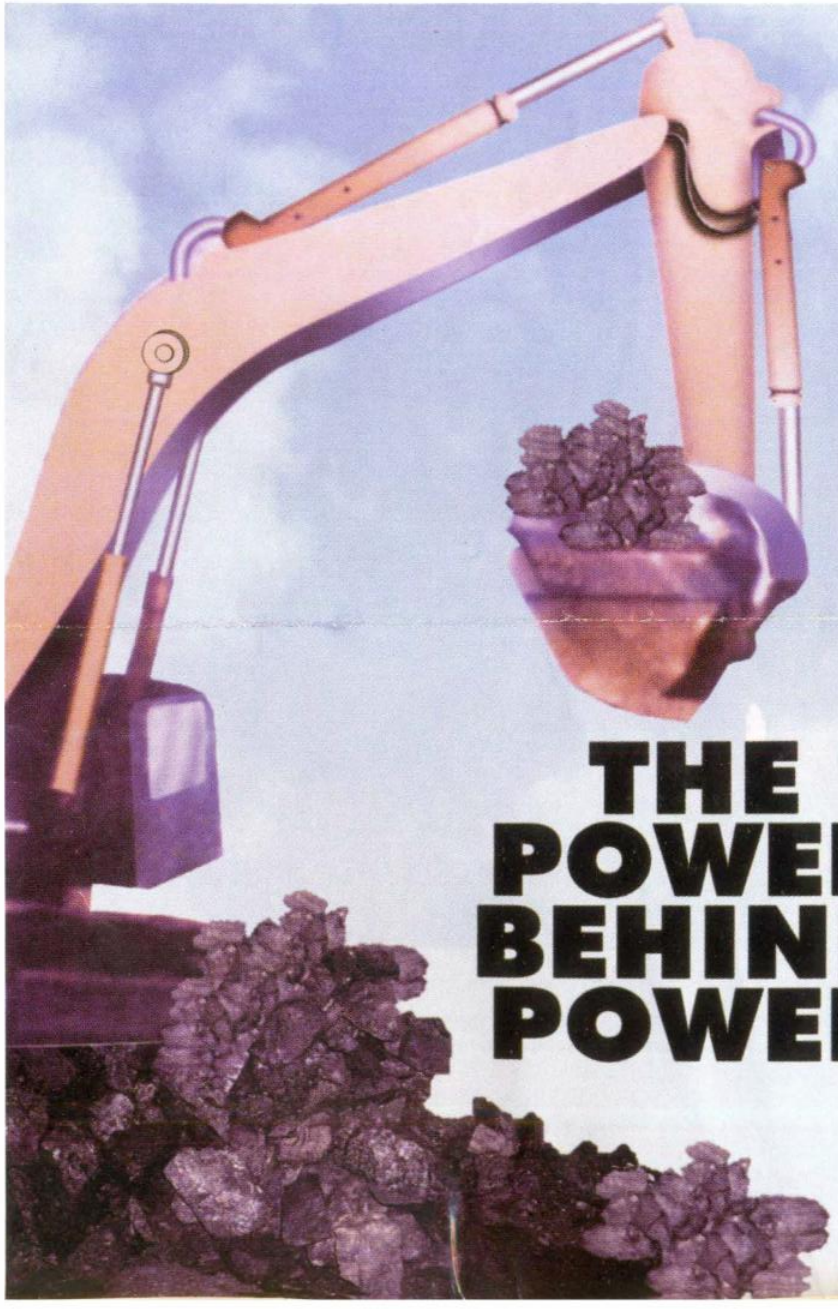

Many diverse activities... one successful philesophy

Added a new dimension in mining of coal and other minerals.

The success of the EMTA Group may be attributed to its philosophy that is based on professional management practices, regular upgradation of skills and knowledge and an unvarying commitment to customer satisfaction. A successful philosophy indeed...

The EMTA Group

The Essence of Power

THE POWER BEHIND POWER

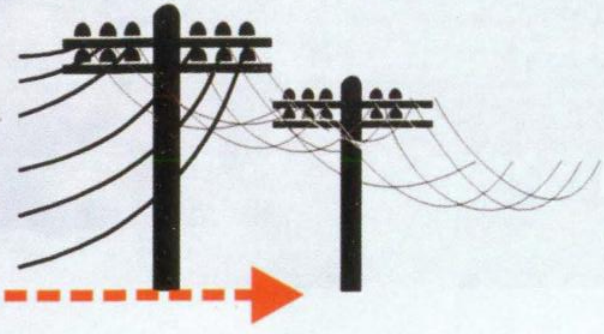

EMTA GROUP OF COMPANIES

105, Central Plaza, 2/6, Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
Ph : 2475 9891, Fax : (91) (33) 2474 9695
E-mail : emta@cal2.vsnl.net.in

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সুকুমার রায়

সুবিনয় রায়

সত্যজিৎ রায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লীলা মজুমদার

নলিনী দাশ

বিজয়া রায়

এঁরা সবাই সন্দেশ-এর সম্পাদক

বাঙালির ছোটবেলা। চার পুরুষ ধরে।

১৩২০ / ১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত
ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

সন্দেশ

তৃতীয় পর্যায়। বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ১। বৈশাখ ১৪১২ মে ২০০৫

বিশেষ রচনা

নবনীতা দেব সেন **হিং টিং ছট** ১৪
সুজয় সোম **গল্প-সল্প** ৩১
সব্যসাচী চক্রবর্তী **দাক্ষিণাত্যের দাক্ষিণ্য** ৩৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ **ফোটা কার্তুজের গন্ধ** ১৬
শৈলেন ঘোষ **ঝুংরিটুং** ৫০

ধারাবাহিক চিত্রনাট্য

সন্দীপ রায় **বোম্বাইয়ের বোম্বেটে** ৬২

বড়গল্প

আবুল বাশার **কোঁচ** ৮৪

গল্প

মহাশ্বেতা দেবী **হতে পারে বাপ্পা এখন...** ৮
লীলা মজুমদার **স্বয়ম্বর** ২২
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় **ভোর** ৪৬
গৌরী ধর্মপাল **অলখ নিরঞ্জন** ৭৮

ছড়া ও কবিতা

প্রমোদ বসু **ইচ্ছে পুষি** ১৩
মৃদুল দাশগুপ্ত **আঁকা, লেখা** ২১
সরল দে **ঘোগ** ৮২
অনির্বাণ রায় **হচ্ছেটা কী!** ৯৮

কার্টুন ও কমিক্স

অমল চক্রবর্তী **ছবির মজা** ৪৫
চণ্ডী লাহিড়ি **টারগেট** ৫৬
ইন্দ্রনীল ঘোষ **স্তব্ধ হৃদয়** ৫৮

বিভাগীয় রচনা

চিঠিপত্র ৭
জীবন সর্দার **প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর** ১০
অরূপ ও বভ্রবী মণ্ডল
কম্পিউটার! কম্পিউটার! ৩৭
অনিরুদ্ধ দেব **মনের কথা কই** ৫৫
জয় মিত্র **কেরিয়ার ক্যাম্প** ৬০
হাত পাকাবার আসর ৭০
শঙ্করলাল ভট্টাচার্য **বই চেনো** ৭৪
রাজশ্রী রাহা **রান্নাবান্না** ৮০
শোভন মান্না **নতুন নতুন আবিষ্কার** ৯৬

প্রচ্ছদপট

সমীর সরকার

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ

সত্যজিৎ রায়
সমীর সরকার
চণ্ডী লাহিড়ি
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
দেবব্রত ঘোষ
অমল চক্রবর্তী
দেবাশিস দেব
সমীর দাশ
সৌমিত্র সোম

আলোকচিত্র

হীরক সেন

সম্পাদক সন্দীপ রায় • সুজয় সোম

সন্দেশ কার্যালয় ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড কলকাতা ৭০০০২০ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড ৫২ রামমোহন রায় সরণি কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত
ফোন • সম্পাদকীয় ৯৪৩৩৩৬৭৩৯৩। সার্কুলেশন ৯৪৩৩১১২৬০৭। বিজ্ঞাপন ২৪৬৩৪৭০১
ফ্যাক্স (৯১) (০৩৩) ২২২৬২৭২৮
ই-মেল sandesh1913@yahoo.co.in

এক আদর্শ নারীর আভিজাত্য

তার স্বর্ণময়ী শোভায়

.... শিল্পের নৈপুণ্য যেথা অপরূপ সৌন্দর্যে

Piaget | Chopard | OMEGA | LONGINES | RAYMOND WEIL | MONT BLANC

B.C.Sen JEWELLERS

Vaibhav 4 Lee Road Kolkata 700 020 Ph 2247 3310 / 1125
74 Rafi Ahmed Kidwai Road Kolkata 700 016 Ph 2244 4098 / 4903
Gold Souk Sushant Lok Phase - I Gurgaon Ph (0124) 511 5201
Web Site www.bcsenjewellers.com

শাশ্বত স্বর্ণালী সম্পর্ক

বাঙালির ছোটবেলা, চার পুরুষ ধরে

একদম পাল্টে ফেললাম 'সন্দেশ'কে। নতুন ভাবনায়, নতুন মেজাজে, নতুন চেহারায়—এ একেবারে ২১ শতকের 'সন্দেশ'। না, এই প্রথম সংখ্যায় সবটা মালুম পাবে না। আস্তে আস্তে খুলে যাবে আরও সব আশ্চর্য দরজা-জানলা—আমরা কীভাবে দেখতে চাইছি আজকের ছোটদের স্বপ্নের পৃথিবীটাকে। আদি 'সন্দেশ' থেকে ধরলে, ৯৩ বছরে পৌঁছে, আমরা 'সন্দেশ'কে চালাতে চাইছি নতুন ঢঙে। ছোট, কিন্তু পেশাদার একটা দল দিন-রাত 'সন্দেশ' নিয়ে ভাবছে, কাজ করছে। সম্পাদকীয় বা শিল্প-বিভাগ ছাড়াও পাবলিসিটি, সার্কুলেশন, বিজ্ঞাপন, প্রোডাকশন। বাংলা ভাষার সমস্ত নামী-দামি লেখক ও আঁকিয়ের পাশে আমরা গুরুত্ব দিতে চাইছি ডাকে আসা, অ-আমন্ত্রিত সেরা লেখাকেও। আমার সঙ্গে সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়েছেন সুজয় সোম—বহুকালের পুরনো 'সন্দেশী'—লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়ের হাতে-গড়া। ১২ বছর বয়েস থেকে সুজয় 'সন্দেশ'-এ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। 'সেরা সন্দেশ' বানাবার কাজেও সুজয়কে সম্পাদকমণ্ডলীতে রেখেছিলেন সত্যজিৎ রায়। এমনকী ৪২ বছর পরে 'সন্দেশ' কার্যালয়ের ঠিকানাটাও পাল্টে গেল।

আগামী সংখ্যা থেকে এই 'চিঠিপত্র' বিভাগও সেজে উঠছে নতুন চেহারায়। 'সন্দেশ'-এর সব-বয়েসি পাঠক-পাঠিকার চিঠির নির্বাচিত অংশ ছাপা হবে। তবে পত্রলেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা থাকা দরকার। ১৭ বছরের কমবয়েসিরা নিজের বয়েসটাও লিখে দিও। বার্ষিক চাঁদা-দেওয়া গ্রাহকরা গ্রাহক সংখ্যা লিখতে ভুলো না। শুধুমাত্র কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হাতের লেখায় চিঠি লিখবে। কোন্ লেখা ও ছবি, মলাট আর অঙ্গসজ্জা কেমন লাগল—ভালো লাগলে কেন ভালো, খারাপ লাগলে কেন খারাপ—আরও কী কী চাও, সব জানাও। 'সন্দেশ'-এর উপযোগী শিল্প-সাহিত্য বা সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে যে-কোনও সরস আলোচনাও আমরা এই বিভাগে ছাপতে চাই। দরকার হলে, চিঠির সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য জুড়ে যাবে।

'বাঙালির ছোটবেলা, চার পুরুষ ধরে'—এটা নিছক নতুন 'সন্দেশ'-এর পেশাদারি স্লোগান বা ব্র্যান্ডিং নয়, অহঙ্কার তো নয়ই। এই বিজ্ঞাপনী বাক্যের আসল সত্যিটা ১৯১৩ সাল থেকে 'সন্দেশ' লিখে চলেছে বাঙালির রোজকার জীবন আর ইতিহাসে, বাঙালির চেতনা ও সংস্কৃতিতে।

নববর্ষের শুভেচ্ছা। ভালো থেকো সবাই।

সন্দীপ রায়

১ বৈশাখ ১৪১২

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

মহাশ্বেতা দেবী

অলঙ্করণ : দেবাশিস দেব

হতে পারে বাপ্পা এখন...

নবারুণ। 'বাপ্পা' বলে ডাকার লোকও অনেক আছে 'বাপ্পাদা', 'বাপ্পাদাদা' বলে ডাকার লোকও অনেক। কিন্তু আজ বোঝানো অসম্ভবই—একসময়ে মনে মনে ভাবতাম—হাত ভাঙুক, পা ভাঙুক—ওর যেন ভয়ংকর কিছু না-হয়।

ছোটবেলা ও ছোট ছোট জ্যান্ত ট্যাংরা মাছ খেতে ভালোবাসত। ও তো পড়ত বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে। থ্রি থেকে ফাইভ মর্নিং স্কুল, সকালে ক্লাস।

মাঝে মাঝে আমি আর বাপ্পা যদুবাবুর বাজারে যেতাম। উঁচু ধাপির ওপর জ্যান্ত ট্যাংরা নড়ছে। বাপ্পা ওই ধাপিটার সমান লম্বা। মাছ কিনেটিনে ফিরেছি। মাছ নামাতে দেখি, আমি যতগুলো মাছ কিনেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি মাছ!

কেমন করে হল?

বাপ্পার চোখ তখনি জলে ভরে যেত। বলত, 'একটু একটু করে টেনে থলিতে ভরে নিচ্ছিলাম। আর করব না মা!'

আমার ইস্কুলের বন্ধু উমা একদিন এসেছে। তারপরেই 'বাবা রে—মা রে—' বলে এমন চেঁচাল, রাঁধতে রাঁধতে আমিও বেজায় ভয় পেলাম।

কী দৃশ্য!

বাপ্পার মুখে দেবশিশুর মতো হাসি।

আরেক হাতে সুতো। সুতোর প্রান্ত একটি কাঁকড়ার পায়ে বাঁধা। সেটি উমার দিকে এগোচ্ছে।

লাফ মেরে উঠে উমা দৌড় মারল।

ক্লাস এইট থেকে একসঙ্গে পড়েছি। অনেক বছর পর তার প্রবেশ ও প্রস্থান একসঙ্গেই ঘটল।

জ্বালাতে পারত বটে!

মামাবাড়িতে ওর দলে ছিলেন আমার মা। ওর ছোটমামা টান্টু, ছোট দুই মাসি সোমা আর শারী। এই মাসিদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব যত, লড়াই তত।

টান্টুকে ও কাঁদিয়ে ছাড়ত।

একবারের কথা বলি। তখন বর্ষাকাল। আমাদের বাড়ির পাশে ধোপঘাটি ছাপিয়ে জল ছুটছে নালা দিয়ে। আর পাড়ার ছেলে-মেয়ে সবাই মাছ ধরছে। টান্টু বেচারা অনেক কৌশলে একটি জ্যান্ত ফলুই মাছ ধরেছে। সে তো গর্বে আটখানা! সত্যিই বড়সড় মাছ। কাঁটায় বিজবিজে। তবু মাছ তো!

এই মাছ নিয়ে কথা হচ্ছে। বাপ্পা উঠে গিয়ে মাছটি ধরে আমাদের কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল। বলল, 'বেশ খেলা করে করে বড় হবে।'

টান্টুর মর্মবেদনা বুঝতেই পারো।

নিরীহদের—যারা ওকে ভয় পায়—তাদের পিছনে লাগতে বাপ্পা ছিল অদ্বিতীয়। একাধিকবার ও ওর সম্পর্কীয় মামাদের (ওর কাছাকাছি বয়স। কেউবা একটু ছোট) 'দেখবি চল, দেখবি চল—' বলে আমগাছের নীচে নিয়ে গেছে, আর ঝুলন্ত মৌচাকে তীর মেরেছে!

শীতকালে সরষের তেল মাখালাম। শীতকালে তেল মাখিয়ে রোদে গরম জলে স্নান করাব, এ হেন ইচ্ছে। হঠাৎ আমি আছি, বাপ্পা নেই। ধোপঘাটির পাশ দিয়ে দৌড়ে ও গড়ের মাঠে। নামই ছিল 'গড়ের মাঠ'। দেখি, বিশাল সবুজ মাঠে এক টুকরো ছোট্ট বাপ্পা ছিটকে বেড়াচ্ছে। পাড়ার সব কিশোররা ওর মামা— আমার দৌড়বাজ ভাই ফল্গুর বন্ধু। সে-ছেলেরাও ওকে ধরবে বলে দৌড়োচ্ছে। ধরলেই তো তেলমাখা গায়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

একা মা বলতেন, 'আহা! কলকাতায় তো এমন মাঠ পায় না!'

এমন গল্প অনেক আছে। আমাকে যেদিন ভয় দেখিয়েছিল, সেই গল্পটা বলে আজকের মতো থামব। পাঠকরা যদি বলো, তাহলে শ্রীমান বাপ্পা, অর্থাৎ নবারুণের অনেক গল্প লেখা যাবে।

দিনটা মেঘলা মেঘলা। হঠাৎ কী মনে হল, মুখ তুলে দেখি খিড়কির গলি দিয়ে বাপ্পা একটা বল জাতীয় কিছু নাচাতে নাচাতে ঢুকছে। আমি ঘরে, ও জানলার ওপারে। আমার চোখে চোখ পড়তেই অতি নিষ্পাপ, সুন্দর হাসি হাসল। তারপর দেখি, কাদা মাখানো একতাল জ্যান্ত কেঁচো হাতে নাচিয়ে নাচিয়ে গোল একটা বল পাকিয়েছে। কেঁচোরা বেরোতে চেষ্টা করছে, বাপ্পা কেঁচোর বল লুফছে।

দেখেই আমি ভীষণ ভয় পেয়ে, সব ভুলে বেজায় দৌড়ে বাবার ঘরে ঢুকলাম। তাঁকে জাড়িয়ে বললাম, 'তুতুল! বাপ্পার হাতে কেঁচোর বল!'

তুতুল আমার চেয়েও বেশি ভয় পেলেন। আর ভীষণ চেঁচালেন, 'বাপ্পা! এখ্খুনি ফেলে দাও—'

তারপর বাড়িতে বেজায় হাঁউ-মাউ-খাঁউ!

সন্ধ্যেবেলা বাপ্পা মা-কে বলছে শোনা গেল, 'এত কষ্ট করে... কেঁচো ধরে ধরে...বল পাকালাম...'

বুঝতেই পারছ, মা এ-কাজেও বাপ্পার বেজায় সমর্থক ছিলেন।

ওর গল্প আরও লেখা যাবে কিনা, তোমরাই বলবে।

জীবন সর্দার

শিশুরাও যে পরিবেশ নিয়ে ভাবতে শিখেছে, আজ সে-কথা বলব। ২০০২ সালের জুন মাসে কানাডার ভিক্টোরিয়া শহরে রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ-কর্মসূচির একটা আন্তর্জাতিক সভা হয়েছিল। ৮০টা দেশের প্রায় চারশো ছেলেমেয়ে সেই সভায় যোগ দিয়েছিল। ওরা সবাই এই কর্মসূচির শিশু-সভার সদস্য। যে-কথাটা শিশু-সদস্যদের ভাবিয়ে তুলেছিল, তা হলো, পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় কেউ ওদের কোনও কথাই কানে তোলেননি।

সেই বছরই ২ সেপ্টেম্বর জোহানেসবার্গ শহরে সব দেশের রাষ্ট্রনেতাদের শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল। বিষয় ছিল উন্নয়নের ধারাকে অপ্রতিহত রাখা। সেই সম্মেলনেও শিশু-প্রতিনিধিদের কথা বলার সুযোগ ছিল। কী বলেছিল ওরা ? ওদের কথার বাংলা তর্জমা করে বলছি, আমি ওদের সঙ্গে একমত। পড়ে দেখ, তোমরাও ওই কথার সঙ্গে সহমত কিনা।

'আমি মিং ইউ লিয়াও। চীন দেশ থেকে এসেছি। আমার সঙ্গে তিন মহাদেশের আরও তিনজন আছে। পরিবেশ নিয়ে ছোটদের ভাবনার কথাই আপনাদের কাছে বলব। আমার সঙ্গে আছে কানাডার জাসটিন ফ্রিসেন, আর ইকুয়েডর থেকে এসেছে আনলিজ ভারগেরা। দশ বছর আগে আপনারা যখন রিও শহরে অধিবেশনে বসেছিলেন, তখন আমরা কোলের শিশু ছিলাম। এখন আমরা যা বলব, তা মোটামুটি একই কথা—তখনও শুনেছিলেন—আরও বহুবার হয়তো শুনে থাকবেন! কারণ, শিশুরা মাটি আর পরিবেশের খুব কাছের। তাই পরিবেশের সমস্যা তাদেরই বেশি সইতে হয়। সব দেশের ছোটরাই এখন হতাশায় ভুগছে। কারণ একটাই। যে গুরুতর সমস্যাগুলো আমাদের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করবে,

বয়স্কদের সেদিকে মোটেই নজর নেই। তাঁদের আকর্ষণ ধনসম্পদের দিকে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের কথা ভাবুন তো।... কেমন পৃথিবী ওদের জন্যে আশা করেন? যেমনটা আপনাদের শিশুকালে ছিল? নাকি তার চেয়েও ভালো সুযোগ-সুবিধে ওরা আশা করতে পারে?... আমাদের কথা না-শুনলে চলবে না। আজকে আমরা এখানে এসেছি, কারণ, আমরা চাই আপনারা মন দিয়ে আমাদের কথা শুনবেন। আমরা চাই আপনাদের নিজেদের মধ্যেকার ভুল বোঝাবুঝি দূরে সরিয়ে রেখে, এমন কিছু ভেবে ঠিক করুন—যা আমাদের সকলকে সমান সুখের সুযোগ দেবে।'

ওই বিশ্বসভায় শিশু-প্রতিনিধিরা বিশেষ কয়েকটা দাবি জানিয়েছিল। সেগুলো কী, এবার মন দিয়ে শোনা যাক।

(১) 'উন্নয়নশীল দেশের জনসাধারণ যাতে নিখরচায় পরিশ্রুত পানীয়জল পেতে পারে, পৃথিবীর সব দেশের সরকারকে অবশ্যই তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

(২) 'পৃথিবীর সব দেশের সরকার অবশ্যই কিয়োটো চুক্তিতে সই করবে এবং সেইভাবে কাজও করবে।' (কিয়োটো চুক্তিতে সব দেশের পরিবেশ দূষণ হয়, এমন উৎপাদন বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণের কথাও আছে। আমেরিকা তাতে সই করেনি। জী স।)

(৩) 'একটা পরিবার ক'টা গাড়ি রাখতে পারবে, তা ঠিক করতে হবে।'

(৪) 'প্রত্যেক শিশুর বিনা খরচে প্রাথমিক স্বাস্থ্য আর যত্নআত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

(৫) 'গাছ কাটলে গাছ লাগাতে হবে। নইলে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে।'

(৬) 'এত সব সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে হাজিরা না-দিয়ে, দেশ-বিদেশের শিশু আর গরিব লোকের জন্যে আরও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।'

(৭) 'পৃথিবীর সব দেশের মানুষ প্রতিদিন চলাচলের বিকল্প কিছু ভাববে। যেমন, হেঁটে, সাইকেলে আর যৌথভাবে গাড়ির মালিকানা নিয়ে।'

অবশেষে, (৮) 'মানুষ যতটা পারবে, চাহিদা কমাবে। চেষ্টা করবে এক জিনিস যত বেশিদিন পারে, ব্যবহার করতে। ফ্যালনা জিনিস নতুন করে বানিয়ে নেবে। চাষিভাইরা মিশ্র সারের ব্যবহার আরও বাড়াবে।'

এই আটটা দাবি জানিয়ে, মিং ইউ লিয়াও তার অন্তরের ব্যথার কথাও বলে।

'অন্য একটা পৃথিবী পয়সা দিলেও আমরা পাবো না। এখানেই আমাদের এবং আগামী বংশধরদের জীবন কাটাতে হবে। সকলেরই জানা, অপরাধ করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। তবে কেন যারা আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করে, সেই দেশ বা লোকেদের শাস্তি দিতে এত অসুবিধে!...'

মিং ইউ আমাদের মনের কথাই বলেছে—তাই না, প্রকৃতি-পড়ুয়া?

নামাঙ্কন : অমল চক্রবর্তী। অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

নিবেদন করছে
TRADITION INNOVATION TRUSTEESHIP
KRISHI RASAYAN GROUP
SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS
phone
22475719
22473760
fax
22471436

সন্দেশের সান্নিধ্যে
ছোটরা বড় হোক
মাথা উঁচু করে॥

শুভকামনায়

Manaksia
Limited
Formerly Hindusthan Seals Limited

Registered Office
8/1 Lalbazar Street Bikaner building Kolkata 700 001
Phone 033-2221 0050 / 2243 5053 / 5054 / 5556
Fax : 033-2220 0336 / 2242 8470

ইচ্ছে পুষি

প্রমোদ বসু

সবাই যেমন কুকুর পোষে,
পক্ষী, গরু, বিড়াল পোষে—
তেমনি আমি ইচ্ছে পুষি।

জানি না, কার সঙ্গদোষে!

সবাই বলে, আমি অলস—
দিন কাটে তো দাঁড়িয়ে, বসে।
'পোষার মতো পোষ্য পেলে
সাধ ক'রে কেউ ইচ্ছে পোষে?'

কিন্তু আমার সময় অল্প
দেখেছিলুম হিসেব ক'ষে।
ইচ্ছে হলো, ইচ্ছে পুষি—
জানি না, কার সঙ্গদোষে!

সবাই আমার সঙ্গে থাকে
সন্তোষে বা অসন্তোষে।
মান ক'রে কেউ ঝাপটা মারে,
কান মুলে দেয় কেউবা রোষে।

ইচ্ছে শুধু বড্ড ভালো,
সঙ্গে থাকে, স্বজন তো সে।
ইচ্ছে ক'রেই ইচ্ছে পুষি—
জানি না কার সঙ্গদোষে!

অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

নবনীতা দেব সেন

হিং টিং ছট

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : দেবাশিস দেব

'ওরে ওরে, জানলা বন্ধ কর। দরজা বন্ধ কর। ঝড় আসছে—' মা দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিতেন। আমরাও ছুটোছুটি করে দোর-জানলা বন্ধ করতুম। চারতলা বাড়ির জানলা-দরজা গোনাগুন্‌তি খুব অল্প নয় তো! হুড়োহুড়ি পড়ে যেতো সারা বাড়িতে। সব্বাই চেঁচাচ্ছে, 'ওরে, জানলা বন্ধ কর।' এদিক-ওদিকে ধড়াস্ ধড়াস্ করে জানলা ও দরজার পাল্লা আছড়ে পড়ছে। কখনওবা জানলার শার্সি ভেঙে কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে মেঝেয়—দারুণ একটা সংকট ঘনিয়ে আসতো হঠাৎ!

আমাদের কুকুর দুষ্টুও ভীষণ চেঁচাতে শুরু করতো। মা-র কথাগুলোই ও কুকুরের ভাষায় ট্রান্সলেট করে আমাদের জানাতো। একতলা চারতলা ছুটোছুটি করতো। মা-র হুকুম ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কিনা, তার খোঁজ-খবর রাখতে হবে তো তাকে! ছোট্ট ছোট্ট পা খুর্-খুর্ করে দুষ্টু দৌড়ে বেড়াতো, লম্বা লম্বা কান, ঝুমুর ঝুমুর করে ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করতো। সামনের নারকোলগাছটা আছাড়ি পিছাড়ি করতো। ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে ওর যুদ্ধ বেঁধে যেতো। কেউ যেন ওকে বেঁধে রেখেছে শেকল দিয়ে মাটির সঙ্গে— সেই বাঁধনটাই ছিঁড়তে যত চেষ্টা ওর! এই সমস্ত যখন ঘটত, তখনই আমরা দিব্যি বুঝে যেতুম—এবার বছর শেষ, নতুন বছর এসে পড়ছে। শুভ নববর্ষ!

ভীষণ কালবোশেখি ঝড়ের হাওয়া আমাদের কাছে নতুন বছর ঘোষণা করে যেতো। কলকাতায় এখনও কালবোশেখি আসে। কিন্তু ঠিক আমাদের ছোটবেলার মতন করে যেন আর আসে না! শান্তিনিকেতনে এখনও কিন্তু অনেকটা সেই আগের মতনই মাঠ পেরিয়ে আসে—আকাশ-জুড়ে বিদ্যুৎ চমকায় ঝড়ের মধ্যে। কলকাতার এত বেশি উঁচু বাড়িঘর, অত জোরে আর বাতাস ছুটতে পারে না। উঁচু বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে খানিকটা যেন নেতিয়ে পড়ে।

সেদিন আগেকার মতো কালবোশেখি ঝড় এসেছিল শান্তিনিকেতনে—মাসটা চৈত্র হলে কী হবে—কালবোশেখি তো ক্যালেন্ডার পড়তে জানে না! এলোমেলো খেলা করল আমবাগানে, জামবাগানে, কাজুবাদামের বনে—দুপুর না-কাটতেই আকাশে ঘনিয়ে এলো গাঢ় আঁধার। তারপর নামল তীরের মতন বিষ্টি।

এই বিষ্টি নামটা আগে খুব মজার ছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পেতুম—সেই কোন দূর-দূরান্ত থেকে মাঠ, ক্ষেত পার হয়ে, সাদা একটা পাতলা ওড়নার মতন বিষ্টির পর্দা এগিয়ে আসছে। চোখের সামনে দেখতে দেখতে বাগান পেরিয়ে পুকুর পেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে বিষ্টি পৌঁছে যেতো বারান্দায়। তারপর হঠাৎই থেমে গিয়ে আকাশে ফুটে উঠতো হলুদ আলো। সব অন্ধকার ধুয়ে যেতো। স্বচ্ছ হলুদ আকাশে বিকেলবেলা এসে পা রাখত। আর আমরা হাঁ করে আকাশে চেয়ে থাকতুম।

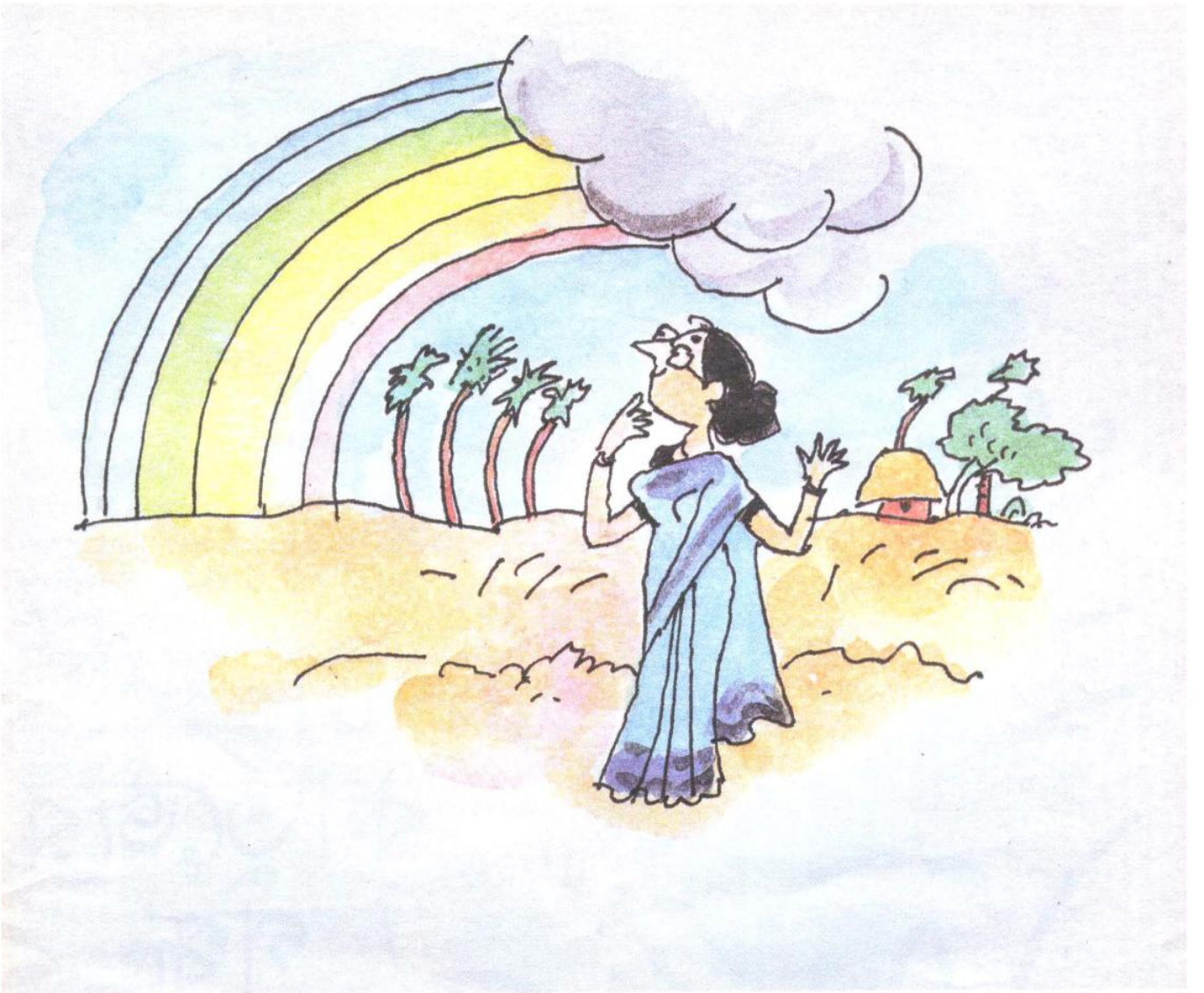

এইরকম আলোতেই তো আকাশে রামধনু ওঠে!

সেদিনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, কালবোশেখি এলো। ঝড়, ঝড়ের পরে জল। সেই বিষ্টির স্বচ্ছ ধারার ওড়নার এগিয়ে আসা নেই। সেই মাঠ-ঘাট-পুকুরও নেই, বাড়িঘর হয়ে গিয়েছে! কিন্তু বিষ্টি যখন থামল, সেই অনেক আগেকার হলুদ আলোটাই ফুটে উঠল আকাশে। ঠিক আমাদের ছোটবেলার আলো! যেটা দেখলে মনে হতো আকাশে এইবারে রামধনু উঠবে।

আমার মেয়েকে ডেকে বললুম, 'জানিস পিকো, এই আলোটা এলেই কিন্তু আকাশে রামধনু উঠতো আমার ছোটবেলায়।'

উছ্‌লে উঠে মেয়ে বলল, 'ওই। ওই তো উঠেছে! দেখতে পাচ্ছো না? ওই যে? পুবদিকের আকাশে?'

তাকিয়ে দেখি—একটি বড় রামধনু উঠেছেন। আর তার কোলে একটি ছোট রামধনু। ঠিক যেন আমি আর আমার মেয়েটা।

বোশেখ মাস তাহলে এসেই গেল। শুভ নববর্ষ।

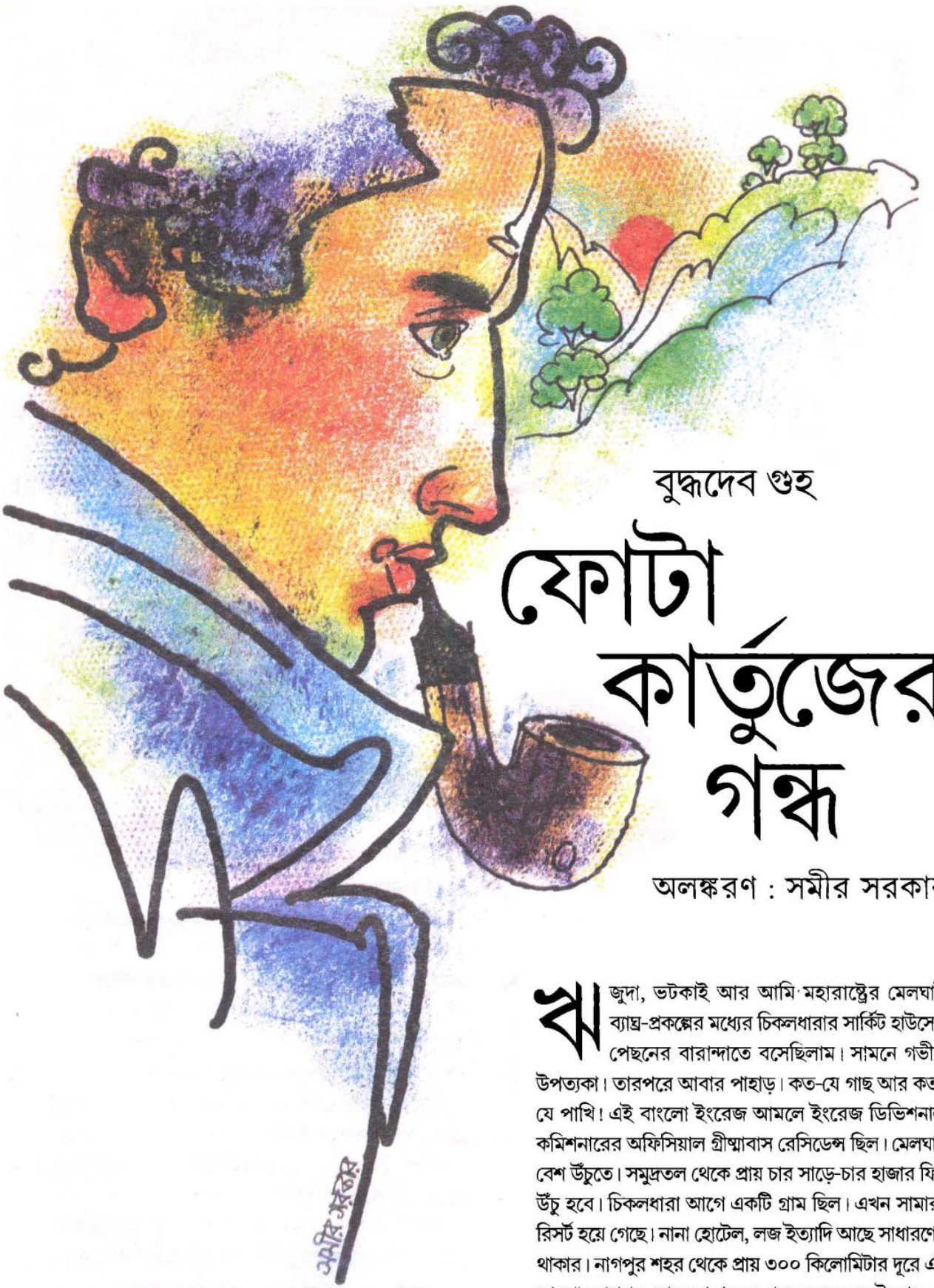

বুদ্ধদেব গুহ

ফোটা কার্তুজের গন্ধ

অলঙ্করণ : সমীর সরকার

ঋজুদা, ভটকাই আর আমি মহারাষ্ট্রের মেলঘাট ব্যাঘ্র-প্রকল্পের মধ্যের চিকলধারার সার্কিট হাউসের পেছনের বারান্দাতে বসেছিলাম। সামনে গভীর উপত্যকা। তারপরে আবার পাহাড়। কত-যে গাছ আর কত-যে পাখি! এই বাংলো ইংরেজ আমলে ইংরেজ ডিভিশনাল কমিশনারের অফিসিয়াল গ্রীষ্মাবাস রেসিডেন্স ছিল। মেলঘাট বেশ উঁচুতে। সমুদ্রতল থেকে প্রায় চার সাড়ে-চার হাজার ফিট উঁচু হবে। চিকলধারা আগে একটি গ্রাম ছিল। এখন সামার-রিসর্ট হয়ে গেছে। নানা হোটেল, লজ ইত্যাদি আছে সাধারণের থাকার। নাগপুর শহর থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে এই জায়গা। নাগপুর থেকে রাস্তা চমৎকার বলে অনেকেই আসেন।

ঋজুদার সঙ্গে কোথাও যাওয়ার মজাই আলাদা। আমরা এসেছি ডিভিশনাল কমিশনারের অতিথি হয়ে। তাই তহশিলদার থেকে এস ডি ও সাহেব সকলেই আমাদের, থুড়ি, ঋজুদাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন গতকাল বিকেলে, যখন আমরা নাগপুর থেকে এসে পৌঁছলাম। নীতিন কাক্কোডকার সাহেব—কনসার্ভেটর অব ফরেস্টস—একটু আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। সকালে এসেছিলেন নীল মজুমদার। তিনিও কনসার্ভেটর অব ফরেস্টস।

নীতিন কাক্কোডকার সাহেব যখন মহারাষ্ট্রের আন্ধারী-তাড়োবা অভয়ারণ্যে পোস্টেড ছিলেন, তখন তাঁরই নির্দেশে বানানো 'ইনফরমেশন সেন্টার'টি দেখে ঋজুদা সেটির প্রশংসা করে একটি কাগজে কিছু লিখেছিল। সেই জন্যেই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিলেন কাক্কোডকার সাহেব। ঋজুদাকে বর্ষাকালে মেলঘাটে আসার নেমন্তন্ন করে গেছেন। বললেন, 'মহারাষ্ট্রের এই মেলঘাট অভয়ারণ্যর রূপ খোলে বর্ষাকালেই।'

সাতপুরা আর মাইকাল পর্বতমালাতে অবস্থিত এই মেলঘাটের এলাকা ১৬৭৭ বর্গ কিলোমিটার। মেলঘাট মানে হচ্ছে অনেক ঘাটের মেলবন্ধন যেখানে হয়েছে। পার্বত্য এই অভয়ারণ্যর রূপই আলাদা হয়ে যায় বর্ষাকালে। বর্ষাকালে যদিও সাধারণ টুরিস্টদের জঙ্গলে ঢোকা বারণ, তবে ঋজুদার বেলা কোনও বাধা থাকবে না।

ঋজুদা বলল, 'আসার চেষ্টা করব। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন ? কলকাতা শহরটা একটা অজগর সাপের মতো। একবার তার মধ্যে সেঁধোলে, সে নিজে যতক্ষণ-না আপনাকে উগরে দিচ্ছে, ততক্ষণ আর বেরোবার জো-টি নেই কারও।'

নীল মজুমদারও এসেছিলেন নাগপুর থেকে। গায়ক কমলেশ ব্যানার্জির সঙ্গে, ঋজুদার গান শোনার জন্যে। নিজেদের গান শোনাবার জন্যেও। ওঁরা নিজেরাও গান-বাজনা করেন। সন্ধ্যের পর ওঁরা দু'জনেই আবার আসবেন হারমনিয়ম সমেত। উঠেছেন ফরেস্ট বাংলোতে। ফরেস্ট বাংলোটিও সুন্দর। তবে সার্কিট হাউসের মতো নয়। এটির ক্লাসই আলাদা। রাতে আসর বসবে গানের। তারপর খাওয়াদাওয়া হবে।

ঋজুদা এমনিতে খুবই নিয়মনিষ্ঠ। কিন্তু গান-বাজনার বেলাতে তার সব আগল খুলে যায়। সময়জ্ঞান একেবারেই থাকে না। ঋজুদা নিজেই বলে যে, তাকে যখন গানে পায়—ভুতে পাওয়ারই মতো—তখন সব বিধি-নিষেধ আইন-কানুন ভুলে যায় সে।

ভটকাই-এর রিপিটেড রিকোয়েস্ট-এ গানের আসর বসার আগে একটি কবিতার আসরও বসবে। নিতান্ত নিরুপায়েই রাজি হয়েছে ঋজুদা। যদিও এখানে ভটকাই-ই একমাত্র কবি। বলতে হয়, ভটকাই-এর একক কবিতা পাঠের আসর বসবে।

কলকাতায় তো বিভিন্ন ভীমরুলের চাক থেকে বেরুনো ঝাঁক ঝাঁক হাজার হাজার কবি। তাদের ভিড়ে পথ চলা দায়! জীবনানন্দ লিখেছিলেন, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'এত কবি কেন ?' আমারও তাই মত। যাঁরাই কবিতা লেখেন, তাঁরা সকলেই কি কবি ? তবে ভটকাই আমার অ্যান্টিথিসিস। আমি যদি বলি সূর্য পশ্চিমদিকে অস্ত যায়, তবে ওকে বলতেই হবে যে, সূর্য পূর্বদিকে অস্ত যায়। অন্য অনেক কবিরই মতো ও জীবনীশক্তিতে ভরপুর। কিন্তু ওর জীবনীশক্তি যে অন্য অনেকের জীবনহানি করে— সে-সম্বন্ধে ও জানলেও, নির্দয় নির্বিকার!

কিন্তু আমি অত্যন্তই ভয়ে ভয়ে আছি, আজ সন্ধ্যেতে ওর কবিতা শুনতে হবে বলে।

একেবারে একা কবি সম্মেলন জমবে না বলে ভটকাই একজন স্থানীয় কবির সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করে ফেলেছে। সেই কবির নাম গোকুল জ্যামখিন্দিকার। তিনি যেহেতু বাংলা জানেন না, আমাদের ভাড়া-করা টোয়োটা কালিস গাড়ির ড্রাইভার অজয় পোপটলালকে দোভাষীর কাজে বহাল করেছে। আসলে গাড়ি নিয়ে এখানে প্রায়ই আসে বলে অজয়ই গোকুলকে চিনত এবং ভটকাই-এর অনুরোধে ওঁকে সন্ধ্যেবেলায় সার্কিট হাউসে আসতে রাজি করিয়েছে। গোকুল আসতে চাননি। ঋজুদার মতো ব্যক্তিত্বের সামনে তিনি কেঁচো হয়ে থাকতে চান না। ভটকাই তাঁকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে রাজি করিয়েছে।

এই চিকলধারাতে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে। ইংরেজরা ভারতের যেখানেই গেছে, সেখানেই অনেকগুলো 'ভিউ-পয়েন্ট' করেছে। অনেকগুলো করে সানরাইজ পয়েন্ট, সানসেট পয়েন্ট করে গেছে। এক-এক পয়েন্টের এক-এক নাম।

ঋজুদা বলে, সৌন্দর্যপিপাসু, রসিক, প্রকৃতিপ্রেমিক হিসেবে ইংরেজ আর জার্মানদের কোনও তুলনা হয় না। অ্যামেরিকানরা একটি সুন্দর প্রাকৃতিক জায়গাকে কী করে কুৎসিত বাজার করে তুলতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ নায়াগ্রা-ফলস্। সৌন্দর্যজ্ঞান ওঁদের নেই। তাছাড়া 'খোদার উপর খোদকারি' করাতেও ওঁদের জুড়ি নেই। ওঁদের সঙ্গে আমাদের দেশের কোনও কোনও রাজ্যের বনবিভাগের আমলারা একাসনে বসার যোগ্যতা রাখেন।

তবে কোনও পয়েন্টেই যাইনি আমরা। হু-হু হাওয়ার মধ্যে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে আমরা বাংলোর পেছনের চওড়া বারান্দাতে বসে সূর্যাস্ত দেখেছি মুগ্ধ হয়ে। পাখিগুলো এমন করে ডাকছিল, যেন ওদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। যদিও এখন শুক্লপক্ষ। তবে তৃতীয়া কী চতুর্থী। চাঁদ দেরি করে উঠবে।

ওই ঠাণ্ডাতে অন্ধকারে আর বেশিক্ষণ বসে না-থেকে আমরা ভেতরে এলাম। তাছাড়া মশাও ছিল। প্রধান ড্রইংরুমে না-বসে, প্রত্যেক শোওয়ার ঘরের লাগোয়া যে একটি করে বসার ঘর

আছে, তারই একটিতে বসলাম আমরা। গানের ম্যায়ফিল শুরু হবার আগেই এই বাধ্যতামূলক কবি-সম্মেলনের হাত থেকে কী করে বাঁচা যায়, তাই ভাবছিলাম। মজুমদার সাহেবরা যত তাড়াতাড়ি চলে আসেন, ততই মঙ্গল। ফরেস্ট বাংলোটা সার্কিট হাউসের কাছেই।

কাল খুব ভোরে উঠে আমরা সেমাডো যাব। সেখান থেকে বন্যপ্রাণী দেখার এলাকাতে। 'সেমাডো' আমরা বলি, কিন্তু আসল শব্দটি হলো 'সেমাডোহ'। মারাঠি কিংবা স্থানীয় আদিবাসী কোরকুদের ভাষার শব্দ এটি। 'ডোহ' মানে জলা জায়গা। আমাদের বাংলার 'দহ'র মতোই আর কী!

আমরা যখন বারান্দাতে বসে সূর্যাস্ত দেখছিলাম, তখন ঋজুদা বলছিল যে, এখানে তাড়াহুড়োতে চলে এলাম নাগপুর থেকে, এই অঞ্চল এবং কোরকুদের সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশোনা করে আসা গেল না। ফিরে গিয়ে করতে হবে। চিকলধারাতে কোরকু রাজাদের একটি মস্ত দুর্গর ধ্বংসাবশেষ আছে। কথায় বলে না—'খণ্ডহর বাতাতি হ্যায় ইমারৎ বুলন্দ থি' ? ওই দুর্গর ধ্বংসাবশেষ দেখে, তা একসময়ে কেমন ছিল, সে-সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাবে।

ভটকাই বলল, 'কী বললে বাক্যটা ?'

'কোন বাক্যটা ?'

'ওই যে কোরকু না খোরকুদের দুর্গ সম্বন্ধে।'

'খোরকু নয়, কোরকু।' ঋজুদা বলল, 'তুই মৃণাল সেনের 'খণ্ডহর' ছবিটা দেখিসনি ?'

'ছবি-টবি দ্যাখে রুদ্র আর তিতির। দুই আঁতেল। আমার সময় কোথায় বলো ? সাধারণ ছাত্র, ঘষে ঘষে ক্লাসে উঠি। তাই পড়াশোনা নিয়েই দিন কাটে। আমার আনন্দ বলো, রিক্রিয়েশন বলো, সবই এই তোমার সঙ্গে জঙ্গলে আসা। আর তোমার জঙ্গল তো মঙ্গল নয়, অমঙ্গল।'

'এটা কিন্তু ঠিক।' আমি বললাম, ফর আ চেঞ্জ ভটকাইকে সাপোর্ট করে, 'জঙ্গলে আনন্দ করতে এসে তুমি একটা-না-একটা ঝামেলাতে ফেঁসে যাচ্ছ।'

'আর তোদেরও ফাঁসাচ্ছি। কী বল ?'

'ফাঁসাচ্ছোই তো। এবারে বলো, খণ্ডহর না কী বলছিলে।'

'খণ্ডহর একটি উর্দু শব্দ। মানে হচ্ছে, ধ্বংসাবশেষ। বাক্যটি বা কহবৎটির মানে হচ্ছে—ধ্বংসাবশেষ দেখেই বোঝা যায় দালানটি কেমন শক্ত-পোক্ত বা বিরাট ছিল।'

ভটকাই বলল, 'আমার মেজমামা চিত্তরঞ্জনের লোকো-এঞ্জিন কারখানাতে কাজ করেন। গত শীতে তিনদিনের জন্যে গেছিলাম। পঞ্চকোট গড় দেখে এলাম। পঞ্চকোট রাজাদের বিরাট দুর্গ, অনেক মন্দিরও ছিল পাহাড়ের উপরে এবং পাদদেশে। এখনঅবশ্য সবই খণ্ডহর।'

আমি বললাম, ঘড়ির দিকে চেয়ে, 'কই রে ভটকাই ? সাতটা তো বাজতে চলল, তোর মারাঠি কবি কোথায় ? কী নাম বললি যেন ? অরেঞ্জ মার্মালেড না অ্যাপ্রিকট জ্যাম ?'

ভটকাই গম্ভীর মুখে বলল, 'এই তো বাঙালিদের দোষ। ভারতবর্ষ যে পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতবর্ষ যে বিরাট স্বরাট একটা দেশ—'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান'—এ-কথাটা কূপমণ্ডুক তোরা কখনও অ্যাপ্রিসিয়েটই করলি না।'

ভটকাই-এর কথাতে আমি ও ঋজুদা একইসঙ্গে হেসে উঠলাম।

ভটকাই মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে রসিকতা আমার ভালো লাগে না। কবির নাম গোকুল, পদবি জ্যামখিন্দিকার।'

ঋজুদা বলল, 'উই আর স্যরি ভটকাই। কিন্তু যে-রকম বাংলা বলছিস আজকাল, তুই আবার ডক্টর পবিত্র সরকারের মতো বিলম্বিত ডক্টরেট না হয়ে যাস।'

'কে বলতে পারে! হতেও তো পারি কোনওদিন। এই কোরকুদের ভাষা নিয়েই অ্যামেরিকান কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করে আসতে পারি।' ভটকাই বলল।

'স্বরাট মানে কী ?' ঋজুদা বলল।

'তুমি বহুৎ পণ্ডিত হতে পারো। সর্বজনমান্য হতে পারো। কিন্তু মাতৃভাষাটাই ভালো করে জানো না। ইটস আ শেইম।'

'ঠিকই বলেছিস। কিন্তু স্বরাট মানেটা তো বলবি ?'

ভটকাই বলল, 'স্বরাট মানে স্বয়ংদৃপ্ত, বুদ্ধ।'

'কোন অভিধানে আছে ?'

'চলন্তিকায়।'

'তাই ? থ্যাঙ্ক উ্য। কিন্তু আর দেরি করা যায় না। মজুমদার সাহেবরা যে-কোনও সময়েই এসে পড়তে পারেন। জ্যামখিন্দিকার বোধহয় তোর ভয়েই কেটে পড়েছে। দ্যাখ তো গিয়ে রুদ্র, অজয় আছে কী নেই গাড়িতে। খবরটা নিয়ে আয়।'

'কেটে পড়লে, সে আমার ভয়ে কাটেনি। তোমার ভয়েই কেটেছে। তুমি তো বাঘ। ও তো জানে যে তহশিলদার, এস ডি ও সবাই তোমাকে সেলাম জানাবার জন্যে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। বড় বাঘকে কে-না ভয় পায়!'

আমি বাইরে বেরোতে যেতেই দেখি গাড়ি পার্ক করে অজয় আসছে। যা ভেবেছিলাম তাই। অজয় বলল, 'উনকি তবিয়ৎ গড়বড়া গিয়া। আনে নেহি শেকেঙ্গে।'

বললাম, 'ঠিক হ্যায়।'

ভেতরে গিয়ে সেই খবর দিতেই ঋজুদা বলল, 'আর দেরি করা যায় না ভটকাই। কবি-সম্মেলন যখন হলো না, তখন তোর একার কবিতাই শোনা যাক।'

আমি বললাম, ' কেমন কবিতা শোনাবি তা জানি না, তবে আমার এক বন্ধু একটা কবিতা লিখেছিল : 'আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে গতকাল।' তেমন কবিতা শোনাস না আবার।'

ভটকাই বলল, 'না, 'আমি অমন ট্র্যাশ লিখি না। মাত্র গোটা তিন-চারেক কবিতাই শোনাব।'

'যা দয়া করে শোনাবি তুই, তাই শুনব আমি আর রুদ্র।' ঋজুদা বলল।

ভটকাই একটু গলা খাঁকড়ে নিয়ে শুরু করল :

'এক ঠোঙা খাবার নিয়ে যায় মতিলাল
তাই দেখে দূর থেকে মারলে ছোঁ চিল।'

'বাবা! এ কী কবিতা!' ঋজুদা বলল।

'অন্ত্যমিল-এর কবিতা। আজকালকার বড় বড় কবিরা অন্ত্যমিল দিতে পারে না বলেই তো গদ্যকবিতা লেখে। সবাই তো আর রবি ঠাকুর নন। তিনি অন্ত্যমিলের শেষ দেখার পরই গদ্যকবিতাতে এসেছিলেন।'

'তা হবে। এবার দ্বিতীয় কবিতাটা শোনা।'

'সদ্যোজাত ফর্সা শিশু যেন একটি ফুল...'

'বাঃ।' ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, 'পরের লাইন ?'

'তার বুকেতে দেখা গেল গোছা গোছা চুল।'

আমরা হতবাক হয়ে ভটকাই-এর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ঋজুদা হাসি চেপে বলল, 'পরের কবিতা ?'

ভটকাই আবৃত্তি করার ভঙ্গিতে বলল,

'দেখে এলাম বৃন্দাবন, মাটি উঁচু-নিচু
ময়ূর-ময়ূরী নাচে উঁচু করে ফুচু।'

এবারে আমরা দু'জনেই হাসি চাপতে না-পেরে হেসে উঠলাম।

ঋজুদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে কমলেশ ব্যানার্জি আর কনসার্ভেটর নীল মজুমদার সাহেব এসে ঢুকলেন। পেছনে পেছনে দু' জন বেয়ারা একটি হারমনিয়ম বয়ে নিয়ে এলো।

মজুমদার সাহেব বললেন, 'এবারে আপনার আর মেলঘাট ঘোরা হবে না বোধহয় ঋজুবাবু।'

'সে কী! কেন ?' ঋজুদা অবাক হয়ে বলল।

'নাগপুর থেকে ডি আই জি ক্রাইম ফোন করে জানালেন যে, আই জি সাহেব বিশেষ অনুরোধ করেছেন আপনাকে এ-ব্যাপারে। ডিভিশনাল কমিশনার তলোয়ারকর সাহেব নিজেই হয়তো ফোন করবেন আপনাকে।'

'কী ব্যাপার ঘটল ?'

'পেঞ্চ টাইগার রিসার্ভ -এ দু'-দুটো বাঘকে মেরেছে চোরাশিকারীরা। শুধু তাই-ই নয়, সে-ব্যাপারে তদন্ত করতে যাওয়া দু'জন অত্যন্ত দক্ষ রেঞ্জার, অর্থাৎ, অ্যাডিশনাল ডি এফ ও-কেও ওরা গুলি করে মেরেছে গতকালই।

'তাই ? ভেরি স্যাড। তা মহারাষ্ট্রে কি গোয়েন্দার অভাব ?'

'অভাব নেই। কিন্তু আপনার মতো বন-বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা যখন এখানে আছেনই, তখন ফরেস্ট সেক্রেটারিও চান যে, আপনিই এই হত্যাকাণ্ডর রহস্য ভেদ করুন।'

'কোন পেঞ্চ-এ এই ঘটনা ঘটেছে ? মহারাষ্ট্রের পেঞ্চ-এ, না মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ-এ ?'

'মহারাষ্ট্রের পেঞ্চ-এ ঘটেছে বলেই-না এখানকার ডিভিশনাল কমিশনার এবং ফরেস্ট সেক্রেটারি আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন।'

আমি বললাম, 'পেঞ্চ-এর জঙ্গলের নাম তো শুনেছি। কিন্তু মহারাষ্ট্রের পেঞ্চ আর মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ মানে ?'

ঋজুদা বলল, 'পেঞ্চ একটা নদীর নাম। নদীটি বয়ে গেছে জঙ্গলের বুক চিরে এই দুই রাজ্যেরই মধ্যে দিয়ে। নদীর একদিকে মধ্যপ্রদেশ, আর অন্যদিকে মহারাষ্ট্র। নদীর উপরে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে একটি বাঁধ এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে।'

তারপর মজুমদার সাহেবকে বলল, 'নদী পেরিয়ে গেলেই তো মধ্যপ্রদেশ। চোরাশিকারীরা যে মহারাষ্ট্রের মধ্যেই আছে, মধ্যপ্রদেশে চলে যায়নি, তা কে বলতে পারে! আর যদি মধ্যপ্রদেশে চলে গিয়ে থাকে, তবে মধ্যপ্রদেশ সরকার তাঁদের রাজ্যে আমাকে মাথা গলাতে দেবেন কেন ?'

'তা নিয়ে আপনার কোনও চিন্তা নেই। মধ্যপ্রদেশ সরকারেরও এ-ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন আছে। তাঁরাও অফিসিয়ালি আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁদের ফ্যাক্স মেসেজও আপনাকে দেওয়া হবে। মহারাষ্ট্রের মধ্যে যা ঘটেছে, তা যে দু'দিন বাদে মধ্যপ্রদেশে ঘটবে না, তা কে বলতে পারে? একটা খুব শক্তিশালী বড় দল এই চোরাশিকারের পেছনে আছে। রাজস্থানের সারিসকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যা উদ্বিগ্ন হয়েছেন, তাতে অন্য সব রাজ্যের বনবিভাগও নড়ে-চড়ে বসেছে। সারিসকাতে বাঘ যে দেখাই যাচ্ছে না, তাও আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

'তা শুনেছি। কিন্তু মেলঘাট ভালো করে ঘুরব বলেই এ-বছরে এলাম নাগপুর থেকে, আর এ কী দুঃসংবাদ শোনালেন আপনি!'

'পেঞ্চ-এর ওই হত্যা-রহস্য ভেদ করার পর আপনি আর আপনার চ্যালারা আবার আসবেন এখানে। চিকলধারা নয়, আপনাকে সেমাডোহ অথবা ঘাটাং-এ নিয়ে গিয়ে রাখব। কাক্কোডকার সাহেব তো নেমন্তন্ন করেই গেছেন। রাখব একেবারে কোর-এরিয়ার মধ্যে। আপনি তো ভি ভি আই পি। দেখবেন, ওই জঙ্গলেও আপনাকে কেমন ট্রিট দি।'

'তাহলে চিকালধারাতে অদ্যই শেষ রাত্রি বলছেন।' হতাশ গলাতে ঋজুদা বলল।

'দয়া করে মার্জনা করবেন আমাকে।' মজুমদার সাহেব বললেন।

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, 'আমাকে দোষ দিস না তোরা।'

ভটকাই বলল, 'তবে কাকে দেব ? তুমি যেখানেই যাও, সেখানেই একটা-না-একটা ঝামেলাতে ফেঁসে যাও। আর আমাদের বেড়ানোর দফারফা হয়।'

'তা তোরাও তো আমার সঙ্গেই থাকিস। যাই-ই আমি করি না কেন।'

'তা অবশ্য থাকি। আমরা তোমার চ্যালা। না-থেকে কী করি ?'

ঋজুদা বলল, 'আসলে তিতিরের কপালে মেলঘাট দেখা আছে। ওকে কাল সকালেই একটা ফোন করে দিস তো বুথ থেকে। এখানে তো টাওয়ার নেই। মোবাইলে পাবি না এখান থেকে। ও তো বলেছিল চার-পাঁচদিন পরেই ও ফ্রি হয়ে যাবে। তাই না ?'

'তাই তো বলেছিল।'

'মজুমদার সাহেব, আমার এক চেলি—তিতির—কলকাতা থেকে প্লেনে এলে, তাকে আমার কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। তখনও যদি আমরা পেঞ্চ-এ থাকি, পেঞ্চ-এই পাঠাবেন। আর মেলঘাট-এ ফিরে এলে, মেলঘাটেই পাঠাবেন।'

'নো প্রবলেম স্যার। আমি নিজে ওঁকে এসকর্ট করে নিয়ে আসব আপনার কাছে।' মজুমদার সাহেব বললেন।

ঋজুদা বলল, 'কমলেশদা, এবারে গান শুরু হোক। আগে আপনি, তারপর মজুমদার সাহেব।'

'আর আপনি ?'

'আরে আমি তো চানঘরে কী বনবাংলোর বারান্দারই গায়ক। আমার গান পরে হবেখন। আপনারাই হচ্ছেন পুরোদস্তুর গায়ক। আপনাদের গান আগে শুনি। মেলঘাট থেকে নির্বাসিত হওয়ার দুঃখ ভোলা যাক আপনাদের গান শুনে।' (ক্রমশ)

আঁকা, লেখা

মৃদুল দাশগুপ্ত

রঙ ছড়িয়ে খুশ-খেয়ালে আমি যখন চিত্র আঁকি
তিনটি শালিক ঝগড়া থামায়, অবাক তাকায় চড়ুই পাখি
মৎস্য ভুলে মাছরাঙা তার নীল রঙটি ধার দিতে চায়
প্রজাপতির ঝাঁক চাইছে তাদের রাখি আমার আঁকায়
গর্ত থেকে ইঁদুর, সেটাও পিটপিটে চোখ দেখছে চেয়ে
রঙ-তুলিরা বেজায় খুশি আজ দুপুরে আমায় পেয়ে!

ওই যে মাঠে চাঁদের দুধের সর জমে যায় যখন পুরু
বাতাস ঈষৎ কাঁপন দিতেই আমার ছড়া লেখার শুরু
এবার যেন তারার মালা খুব গোপনে নামছে কাছে
'অ' লিখছে 'আ' লিখছে দশ জোনাকি বকুল গাছে
এই ছড়াতেই আজ আমাকে তোমার কাছে আনলো হাওয়া
সেই তো আমার পরম পুলক, সেই তো আমার পদক পাওয়া!

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

লীলা মজুমদার

স্বয়ম্বর

বড়রাজকন্যের জন্য বর খোঁজা হচ্ছে। রানিমার মেজাজ মোটেই ভালো নেই, সোনার খাটে বসে রুপোর খাটের ওপর দারুণ বিরক্তির ট্রঙ্গ পা নাচাচ্ছেন। সোনার মলের ঘুন্টিগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাটিতে গড়িয়ে যাচ্ছে, সখিরা কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখছে।

মেজরাজকন্যেরও মেজাজ ভালো নেই। দিদি যেন কী! এত ভালো ভালো সব বর আসে—তবু এ ভালো না, ও ভালো না, সে ভালো না! আরে, তোর বিয়ে না-হলে আমারও যে হবে না, সে-কথা ভেবেছিস? তাছাড়া তোর রঙটাও তো আমার চেয়ে কালো, তোর অত বাচ্‌বাছাই কি শোভা পায়?

রানিমা বললেন, 'হেতমপুরের রাজপুত্তুরকেও তোর মনে ধরল না?'

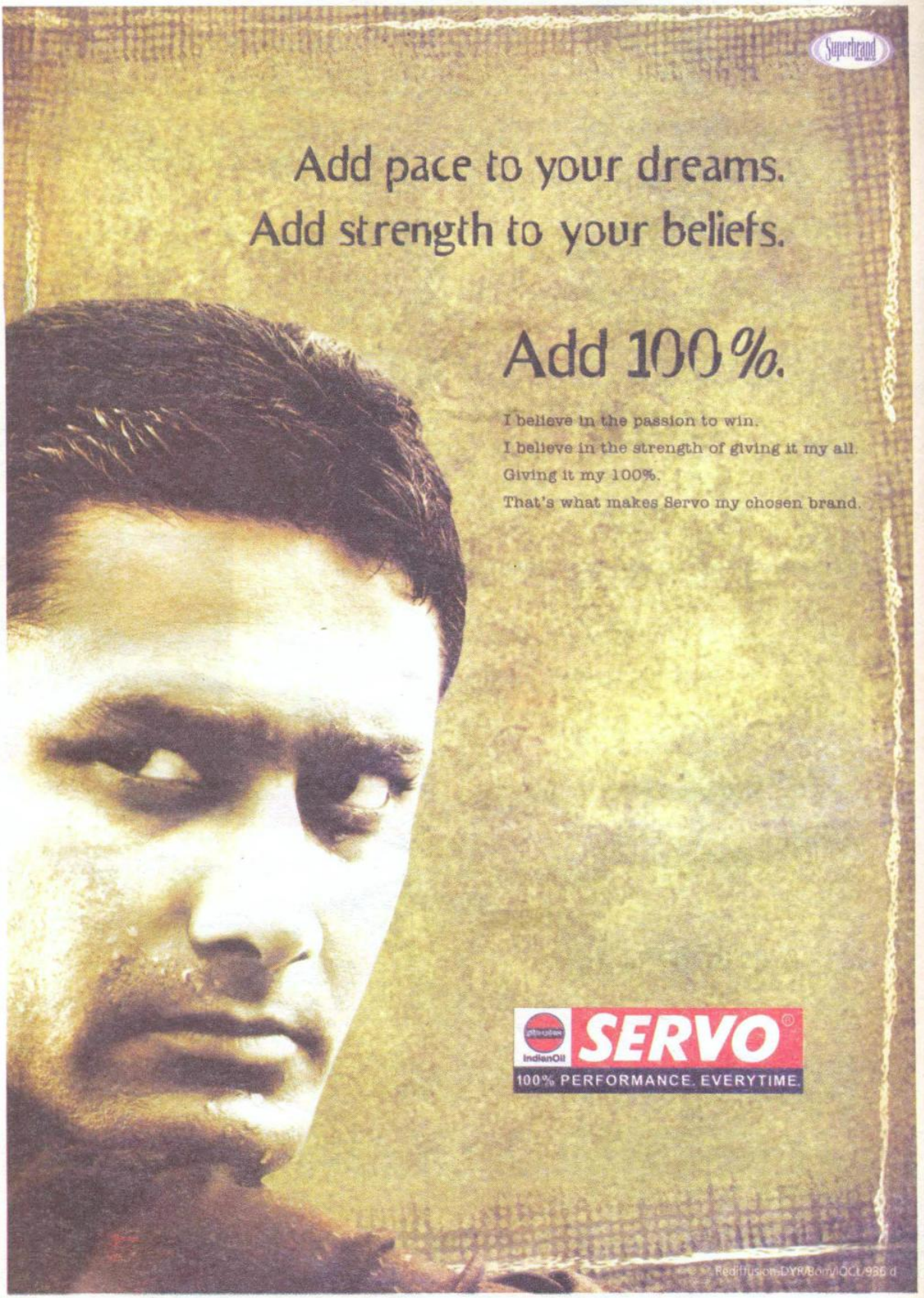
Superbrand
Add pace to your dreams.
Add strength to your beliefs.
Add 100%.
I believe in the passion to win.
I believe in the strength of giving it my all.
Giving it my 100%.
That's what makes Servo my chosen brand.
IndianOil
SERVO
100% PERFORMANCE. EVERYTIME.

বড়রাজকন্যে জানলার ধারে খোলা চুলে দাঁড়িয়ে শুকপাখিকে আঙুর খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, 'যার দাড়ি আছে, তার গলায় মালা দিতে পারব না।'

ঝাঁঝাঁলো সুরে মেজরাজকন্যে বললেন, 'জঙ্গিপুরের রাজার দাড়ি ছিল না।'

'যার গোঁপ ঝুলে পড়ে, তার গলাতেও মালা দিতে পারব না।'

মেজরাজকন্যে কী-যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তোলা হাঁড়ির মতো মুখ করে স্বয়ং রাজা এসে ঘরে ঢুকলেন। সখিরা সব তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে, কানখাড়া করে বসলেন।

রাজা একতাড়া সোনালি-রুপোলি সিলমোহর দেওয়া চিঠি রানির পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ধেৎ! কাল রোববার, ভালো দিন দেখে একশোজন রাজা-রাজড়াকে কাঞ্চনমালার স্বয়ম্বর সভাতে নেমন্তন্ন করলাম। নীচে লিখেও দিলাম—বুনো মোরগের পোলাও হবে। এই দ্যাখো, আটানব্বইখানা উত্তর এসেছে—রাজাদের সব ব্যামো হয়েছে। বুনো মোরগ খেলে বেড়ে যাবে, তাই কেউ আসতে পারবে না।'

মেজরাজকন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'বাকি যে-দু' জন—তাদের সঙ্গে দিদির বিয়ে দিয়ে দাও না।'

রানি বললেন, 'চন্দ্রা ! ভালো রাজকন্যেদের দেখা যায়, শোনা যায় না।'

রাজা বললেন, 'সে-দু' জন উত্তর দেয়নি। বীরনগরের বজ্রধ্বজ আর মেঘনগরের শ্যামলকুমার।'

বড়রাজকন্যে কানের পেছনে গোলাপফুল গুঁজতে গুঁজতে বললেন, 'দ্যাখো বাবা, দাড়িওয়ালা কী ঝুলোগোঁপওয়ালা, কী টাকমাথা, কী ভুঁড়িওয়ালা—আমি কিন্তু বিয়ে করতে পারব না। যারা জোরে জোরে কথা বলে, পেট ঠেসে খায়, ভারী ভারী জুতো পায়ে দেয়—তাদের আমি বিয়ে করতে পারব না। যারা কেবল টাকার গল্প, রাজত্বের গল্প, যুদ্ধের গল্প, শিকারের গল্প করে—তাদের আমি বিয়ে করতে পারব না। যাদের মোটা মোটা আঙুল—তাদেরও আমি বিয়ে করতে পারব না। যাদের হাতে কালো কালো লোম—তাদেরও আমি বিয়ে করতে পারব না।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী! তবে কি তুই রামকিষ্ট মিশনে যাবি নাকি?'

রানি কোনও কথা না-বলে, সোনার খাটে মখমলের বালিশে মাথা রেখে মুচ্ছো গেলেন।

মেজরাজকন্যে রেগেমেগে বললেন, 'দিদি, সবটাতে তোমার চালাকি চলবে না বলে রাখলাম!'

বড়রাজকন্যে রাজার কাছে এসে, রাজার দাড়িতে নাক ঘসে আদর করে বললেন, 'কীরকম বর চাই জানো? যার চিত্তটা বাতাসের মতো হালকা। চোখ দুটো সাগরের মতো গভীর। মনটা চাঁদের আলোর মতো। গলার আওয়াজ বেণুবনের মধ্যে মর্মরধ্বনির মতো। শরীরটা গুণ-পরানো ধনুকের মতো। যে চারবেলা রুটি পুরি মাছ মাংস ক্ষীর সন্দেশ গেলে না। যে ঘুমোলে নাক ডাকায় না। যার কানেও লোম নেই। যাকে কখনও দাঁত মাজতে বা দাড়ি কামাতে কেউ দ্যাখেনি। যে দু' বেলা কবিতা পড়ে—আগাগোড়া 'মেঘদূত' যার মুখস্থ।'

রাজা বললেন, 'বা-ব্বা! সে কী কখনও হয় রে? আজকাল আর ওরকম তৈরি হয় না। একটু কেটে-ছেঁটে চলনসই করে নেওয়া যায় না?'

বড়রাজকন্যে নাক সিঁটকে বললেন, 'চলনসইকে আমি বিয়ে করতে পারব না।' বলে কেঁদে-কেটে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিলেন।

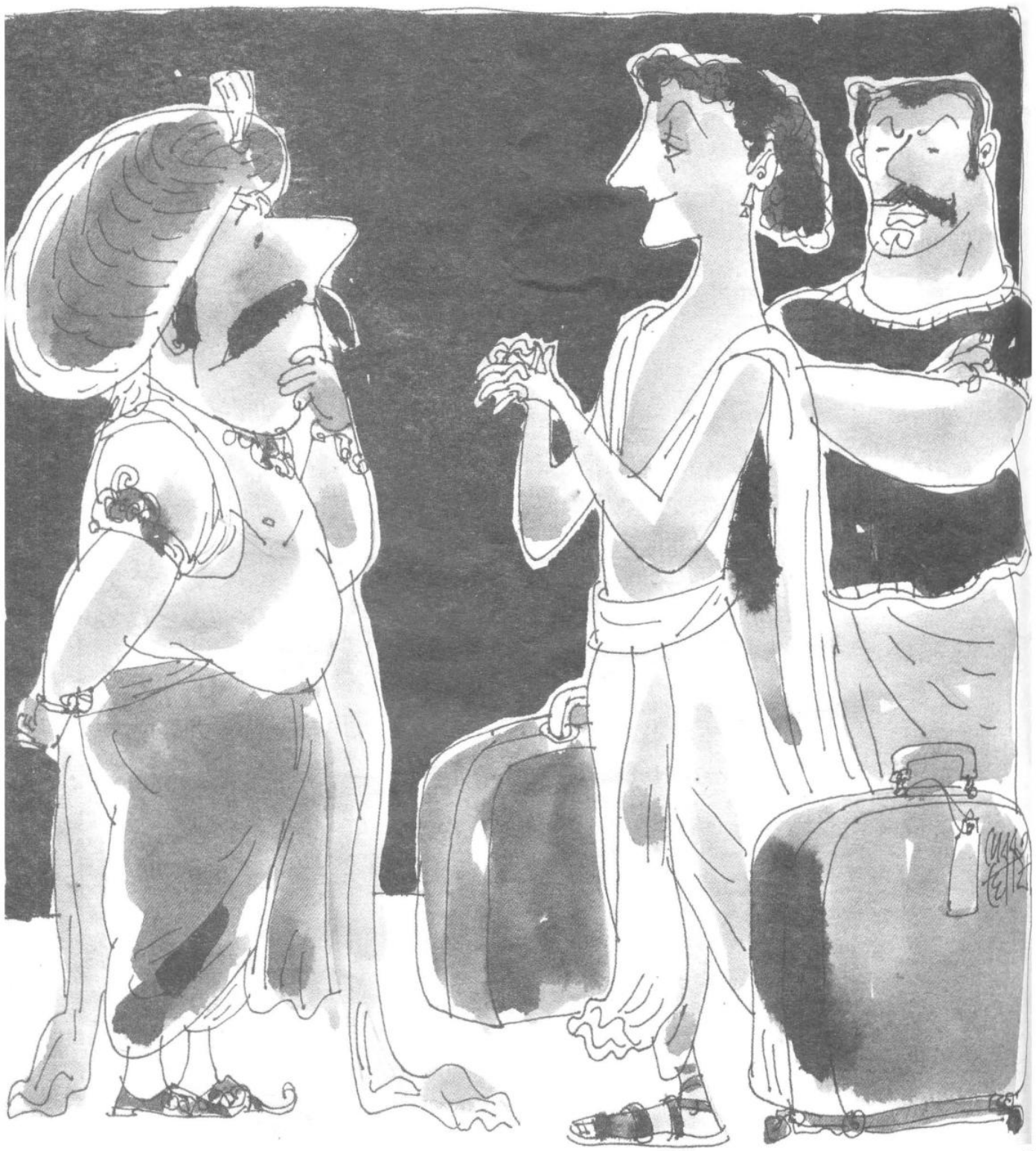

মেজরাজকন্যে বললেন, 'কেন, বড়দের কেন আগে বিয়ে হবে? আমি তো দিদির চেয়ে লম্বা।' বলে তিনিও কেঁদে-কেটে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিলেন।

রাজা দু'-একবার 'ও রানি—ও গিন্নি—'বলে ডাকাডাকি করলেন। রানি 'অ্যাঁ!' বলে পাশ ফিরে আরও মুচ্ছো যেতে লাগলেন।

চিন্তিতভাবে সভাঘরে ফিরে এসে রাজা দেখেন—ইতিমধ্যে দু'জন ছোকরা রাজপুত্র এসে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে সুটকেশ ইত্যাদি দেখে মনে হয় থাকতে এসেছেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করে, কুশল ও পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

যিনি লম্বা-চওড়া, রোদে ঘুরে ঘুরে গায়ের রঙ যাঁর তামাটে, তিনি বুক চাপড়ে জলদ্‌মন্দ্রের মতো গলায় বললেন, 'আমার নাম বজ্রধ্বজ। রাজা আমাকে স্বয়ম্বর সভায় নেমন্তন্ন করেছেন। বলেছেন বুনো মুরগির পোলাও হবে। রাজার খাস খানসামার প্রশংসা দ্যুলোকে ভূলোকে কে না শুনেছে? তার রান্না খাবার জন্য লোকে নাকি বিপদকে বরণ করে নিতে ভয় পায় না—দু'-একটা বিয়ে-থা তো ছার কথা! তাছাড়া রাজার জামাই হলে, চাই কী খানসামাকে যৌতুক রূপেও পেতে পারি। কত লোকে তো হাতি ঘোড়া বাঁদর পায়।'

রাজা শিউরে উঠে কানে হাত দিলেন। অপরজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী পরিচয়?'

বেণুবনে মর্মরধ্বনির মতো তাঁর গলার আওয়াজ। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। সাদা পোশাক। কোঁকড়া চুল। ঢুলু ঢুলু চোখ।

রাজা তাই দেখে-শুনে খুশি-খুশি হয়ে আবার বললেন, 'তুমি কে বলো তো?'

'আমি শ্যামলকুমার। মেঘদূতের মেঘ অলকায় গেল যক্ষসুন্দরীর কাছে। আর আমি চিঠি পেয়ে ছুটে এলুম রাজকুমারীর চরণপ্রান্তে।'

রাজা খুশি হয়ে বললেন, 'তা বেশ, বেশ! দ্যাখো মন্ত্রীমশাই, এদের থাকবার জন্য ভালো ঘর, চানের ঘরে সুগন্ধী গরম জল, রেশমি তোয়ালে আর হাতির দাঁতের খড়ম দিও। ঘরেই এখন মিষ্টান্ন জলখাবার দিও। সন্ধ্যেবেলায় জলসাঘরে গান-বাজনা হবে। তারপর সবাই একসঙ্গে ভোজ খাওয়া যাবে।'

শ্যামলকুমার বললেন, 'ফল-মিষ্টিতেই আমার যথেষ্ট হবে। খাওয়া জিনিসটা বড় স্থূল, বড় বৈষয়িক। ওটা আমি যতটা পারি কমিয়ে এনেছি, প্রজাপতিদের মতো।'

রাজা তো আহ্লাদে আটখানা। বললেন, 'আমার কাঞ্চনমালাও খাওয়াদাওয়া, দাড়ি-গোঁপ, নাকডাকানো কী ওই ধরনের জিনিস পছন্দ করে না। ভালোই হলো, ভালোই হলো।'

রাজপুত্রদের যে-যার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁরা চানটান করলেন, কাপড়-চোপড় পাল্টালেন, ফল-মিষ্টি খেলেন।

কিনা। আর শ্যামলকুমার লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখে নিয়ে ঠাওর করতে চেষ্টা করছেন কোন মেয়েটা কাঞ্চনমালা।

গান-বাজনার পর খাওয়াদাওয়ার পালা। রাজা এবার রাজপুত্তুরদের রানির মহলে নিয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। মখমলের আসনের সামনে ছোট একটা করে শ্বেতপাথরের চৌকিতে প্রত্যেককে আলাদা করে খাবার দেওয়া হলো। রানি নিজে পীড়াপীড়ি করে খাওয়ালেন, রাজকন্যেরা আর সখিরাও রঙিন প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বজ্রধ্বজ চেটেপুটে সব খেয়ে ফেলে বললেন, 'বেড়ে রেঁধেছে রাজামশাই। ওটি আপনার একটা রত্ন। ওকে যে লাভ করবে, সে ভাগ্যবান!'

লাভটাভের কথা শুনে রাজার একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। শ্যামলকুমারের দিকে চেয়ে দেখলেন—তিনি এক টুকরো পুরি দু'-আঙুলে ভেঙে, একটুখানি ক্ষীর দিয়ে একবার মুখে দিয়েছেন। আর লাল কুদ্রুমের চাটনি একবার একটু চেটে দেখেছেন।

বড়রাজকন্যে মুগ্ধ হয়ে সেইদিকে চেয়ে রয়েছেন।

রাজা গদগদ হয়ে বললেন, 'আমার কাঞ্চনমালাও ঠিক এইরকম, কিচ্ছু খায় না। কী করে যে বেঁচে থাকে, সেই এক আশ্চর্যের বিষয়! খাওয়াটাকে ও একটা বদঅভ্যেস মনে করে। আমি আবার একটু খেতেটেতে ভালোবাসি।' বলে রাজা নিজের ও বজ্রধ্বজের পাতে আর-একটু রাবড়ি আর রসগোল্লা দিতে বললেন।

খাওয়াদাওয়ার পর সকলে শিগগির শিগগির শুতে গেলেন। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। কাল আবার স্বয়ম্বর সভা হবে। তারপর দুপুরে সেই গ্র্যান্ড বুনো মোরগের পোলাও!

যে-যার ঘরে আবলুশ কাঠের খাটে শুয়ে, মখমলের বালিশে মাথা দিয়ে, স্যাটিনের চাদরে গা এলিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু ঘুম কী আর আসে? শ্যামলকুমারের শুধু যে বার বার কাঞ্চনমালার কথা মনে হচ্ছে তা নয়, বুকের মধ্যে কত দিনের কত দুঃখের কথা জমা তো রয়েছেই। উপরন্তু পেটটাও কীরকম অস্বাভাবিক খালিখালি ঠেকছে। যাঁরা কাব্য সেবা করে থাকেন, তাঁদের জীবন এইরকমই হয়!

হঠাৎ সেই অন্ধকার রাত্তিরের মধ্যে থেকে খুট করে একটা আওয়াজ হলো। অজানা আশঙ্কায় মেঘনগরের রাজকুমারের বুকটা ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। কোনও দুষ্টুলোক কাঞ্চনমালার অনিষ্ট করতে আসেনি তো?

রাজপুত্র একেবারে উঠে পড়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

দু' ধারে দু' সারি ঘর, মাঝখান দিয়ে লাল গালচে মোড়া লম্বা বারান্দা চলে গিয়েছে। রাজপুত্র শিউরে উঠে দেখলেন—ছোট্ট একটা তেলের প্রদীপ এক হাতে, আর রুপোর থালায় ঢাকা—কী জানি কী বিষটিষ হবে—অন্য হাতে নিয়ে পাপিষ্ঠ চেহারার এক বুড়ি পা টিপে-টিপে চলেছেন। নিশ্চয়ই কাঞ্চনমালার চেয়ে কম সুন্দরী কোনও হিংসুটে রাজকুমারীর অনুচর।

ভয়ে হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে গেলেও, শ্যামলকুমারের বুকে অমানুষিক শক্তি এলো। অন্ধকারের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে তিনি বুড়ির পিছু নিলেন।

কয়েকটা ঘর পরে ডানদিকের বন্ধ দরজার আড়ালে বজ্রধ্বজও স্যাটিনের বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছিলেন। টের পাচ্ছিলেন—তৃতীয় বারের রাবড়ি রসগোল্লা খাওয়াটা বুদ্ধির কাজ হয়নি। হঠাৎ তাঁর কানেও নৈশ অন্ধকার ভেদ করে একটা মৃদু খস-খস থুপ-থুপ শব্দ এলো। তিনিও

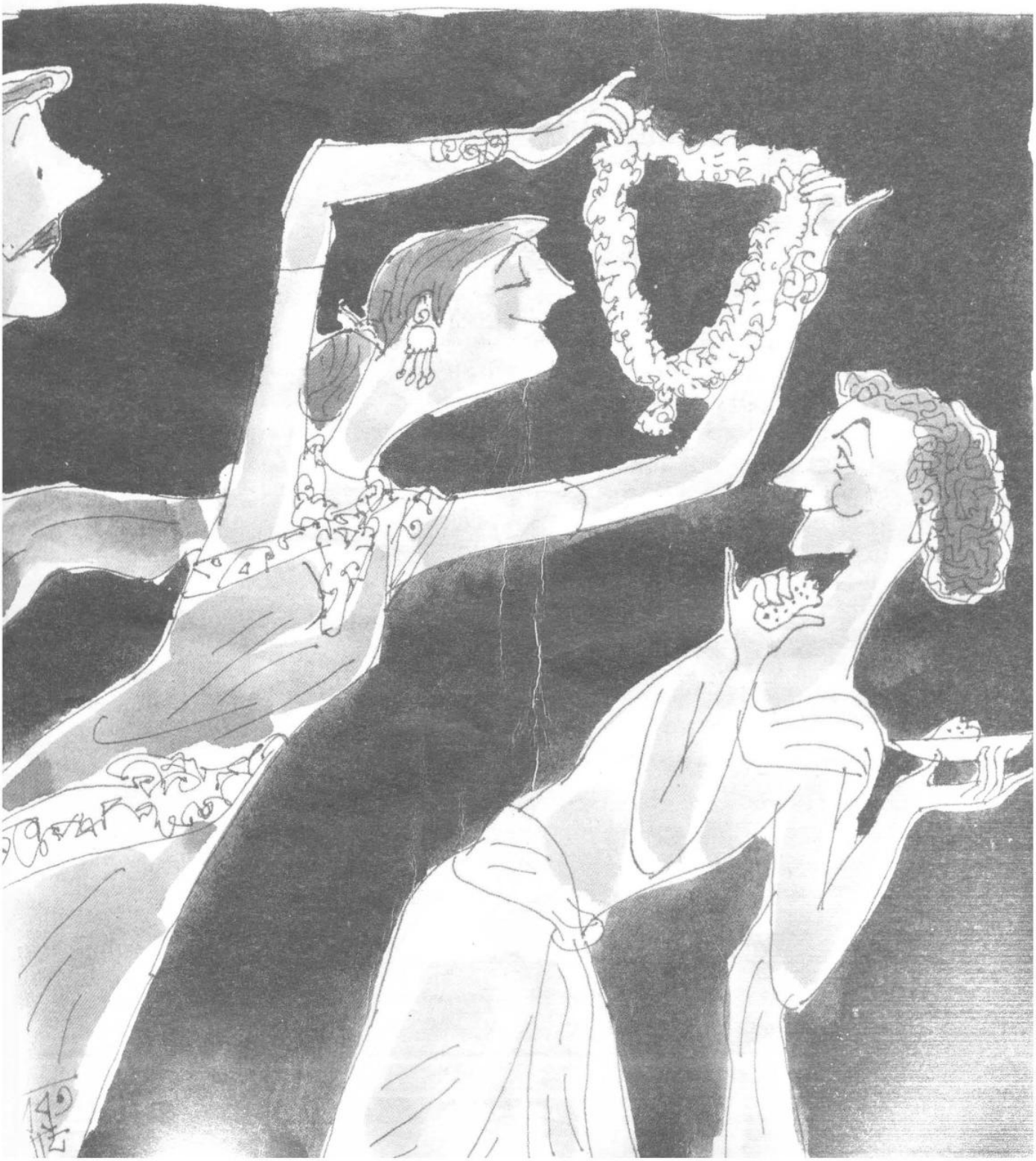

লাফিয়ে উঠে, পাশ থেকে ভোজালিটা তুলে নিয়ে, নিমেষের মধ্যে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে দেখলেন—আগে আগে ক্ষীণ প্রদীপ হাতে এক বুড়ি চলেছেন, তার পেছন পেছন অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে মেরে সাদা কাপড়-পরা একজন লোক অতি সন্দেহজনকভাবে চলেছেন। আর বারান্দায় ভুর-ভুর করছে কীসের যেন একটা গন্ধ ।

নিঃশব্দে তিনজন চলেছেন। আগেররা কেউই টের পাচ্ছেন না—পেছনে আবার লোক লেগেছে। বুড়ি গিয়ে একটা বন্ধ দরজায় তিনটে টোকা দিলেন। নিশ্বাস বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যে বাকিরা দাঁড়িয়ে রইলেন।

দরজাটা খুলে গেল। আধাখোলাই রইল। এক ফালি আলো এসে বাইরে পড়ল। সেই আলোতে বজ্রধ্বজ ও শ্যামলকুমার এ ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঘরের ভেতর তাকিয়ে দেখলেন—বুড়ি প্রদীপটা একটা চৌকির ওপর নাবিয়ে রেখে, একগাল হেসে থালার ঢাকনিটা খুলে ধরেছেন। আর নীল বেনারসি-পরা কাঞ্চনমালাও একগাল হেসে হাত বাড়িয়েছেন। হঠাৎ চোখ তুলে দরজার ফাঁকে মানুষের ছায়া দেখে কাঞ্চনমালা ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

বুড়ি থালাটা ঢাকা দিয়ে ফেলবার আগেই শ্যামলকুমার ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বললেন, 'দেখি দেখি, ওটা কি মাছের চপ নাকি? আর এই লম্বা-লম্বাগুলো আবার কী?'

আধখাওয়া একটা চপের ওপর দিয়ে কাঞ্চনমালা তাঁর গলা থেকে ফুলের মালা খুলে শ্যামলকুমারের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'দূর! স্বয়ম্বর-টয়ম্বর একটা বাজে ব্যাপার।'

শ্যামলকুমারও চপে একটা কামড় দিয়ে বললেন, 'যা বলেছ রাজকন্যে।'

দরজার কাছ থেকে বজ্রধ্বজ ফোঁস করে একটা শব্দ করলেন।

'ছি-ছি! এরকম করে লোককে ঠকানো! তাছাড়া আমি মরছি বেশি খেয়ে, আর এরা গভীর রাত্তিরে দিব্যি চপ কামড়াচ্ছে!'

ঘাড় ফিরিয়ে বজ্রধ্বজ দেখলেন—কাঞ্চনমালার চিৎকারে রাজা-রানি, মেজরাজকন্যে, জনা সাত-আট সখি, প্রহরী ইত্যাদি সব সারি বেঁধে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, উঁকি মেরে ঘরের ভেতর দেখতে চেষ্টা করছেন।

বজ্রধ্বজ ভোজালি ফেলে দিয়ে রাজামশাইকে বললেন, 'ছি-ছি! এঁদের আপনি নি-খাকি বলেন! কী মিথ্যেবাদী! কী ঠগ !'

মেজরাজকুমারী তাড়াতাড়ি ভোজালিটা তুলে দিয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু কখনও মিছে কথা বলি না।'

তারপর ভালো দিনক্ষণ দেখে রাজবাড়িতে ডবল বিয়ে হলো। আর সে কী খাওয়ার ঘটা!

অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

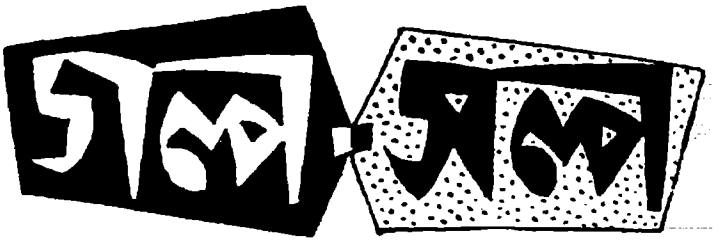

সুজয় সোম

ভোরবেলা ঘুম-চোখে খবরের কাগজ খুললেই, গা-পিত্তি জ্বলে ওঠে! চারদিকে নিষ্ঠুরতা, হাহাকার, চাতুরি আর তিক্ততা। রেষারিষি, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বপ্নভঙ্গ, ব্যর্থ প্রেম। লোকের মনে আর মুখে কেন এত সাপের বিষ ? খালি প্রতিহিংসা, লোভ, দুর্নীতি, হানাহানি। রাজনীতির অতি চালাকি। ধর্ম আর জাত-পাত নিয়ে বদমাইশি। শুভবুদ্ধিকে গলা টিপে খুন। থেকে থেকেই বাহুবলের ঘনঘটা। এমনকী ইশকুলের মেয়েদের লাঠি পেটায় পুলিশ, গোবেচারা আদিবাসীদের পুলিশ গুলি করে মারে! হরদম লাঞ্ছনা ও অপমানে মানুষ ক্ষত-বিক্ষত। ওই-যে দ্যাখো দ্যাখো—গা ঘিন্‌ঘিনে, পাজি লোকেদের দিগ্বিজয়!... কী জানিস, যে-কোনও ব্যাপারে অ-যোগ্যরা যখন অঢেল ক্ষমতা পায়, ব্যাটাদের মাত্রাজ্ঞান থাকে না। যেমন গুজরাট, যেমন মণিপুর।

ভারতের স্বাধীনতা বলতে আসলে যা হয়েছে, সে আর কহতব্য নয়! সব মেকি, সব মিথ্যে। যত দিন যায়, স্বাধীনতা ততই ধূসর, ঝাপ্‌সা হতে থাকে! সারাক্ষণ দুর্নীতি, ভণ্ডামি, দলাদলি আর ফাঁকিবাজির মোচ্ছব। শুধু রাজা-বাদশারাই নয়, সাধারণ লোকেও আজকাল তিড়িং-বিড়িং করে ঘুস দিতে দিতে আর পেতে পেতে, কেমন যেন আহ্লাদে গলে যায়! সবাই এখন শৌখিন। লোভ এবং ভোগ ছাড়া, আমরা সব ছাড়তে রাজি। জীবনের মোক্ষ বলতে পার্থিব সাফল্য। দুর্নীতিকে এখন শিল্পকলাও বলতে পারিস! ছোটখাটো লাভ-ক্ষতি কিম্বা দরাদরিতেও আমাদের কীরকম নেশা লেগে গেছে! দিন-রাত আঁকুপাঁকু করে যে-যার আখের গুছোতে ব্যস্ত। উপযুক্ত ঘুস দিয়ে প্রায় সমস্ত জায়গায় যে-কোনও কাজ হাসিল করা যায়! ওরে, আমরা নীতিবোধ হারিয়েছি। তার চাইতে বড় সর্বনাশ আর কী হতে পারে ? কে তোয়াক্কা করে দেশপ্রেমের ? মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের আদর না-জানলে, দেশকে ভালোবাসা যায় না। তাই তো গুজরাটে ধর্মীয় গণহত্যার চাষ হয়!

আহা, প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল মন্দ লোকেদের কী বোলবোলা! কাঁচা বয়েসেই পষ্ট জেনে রাখো—দিন-রাত ঘুস দিতে না-পারলে, বেঁচে থাকার দিশে পাবিনে! রঙচঙে, স্বপ্নের ইশকুলে আদরের শিশুকে ঢোকাবার জন্য হাজার হাজার টাকা ঘুস দিয়ে, অতি উজ্জ্বল মা-বাপেদেরও গর্বে বুক ফুলে ওঠে! বালাই ষাট, সেইসব হিরের টুকরো ছেলেপুলে নির্ঘাৎ 'মানুষ' হচ্ছে। তবে সংস্কৃতি থেকে মেধা থেকে বন্ধুত্ব—সবেতেই এখন ভেজাল! ঘাঘু চোর-ছ্যাঁচড়ও ভয়ানক বেড়ে গিয়ে, আমাদের জীবনটা যাচ্ছেতাই হয়ে উঠেছে। শব্দ আর বাতাসের সবরকম পলিউশনকে, এমনকী টেলিভিশন আর হিন্দি সিনেমার চটুল রঙ-তামাশাকে—কী মজা, ও-সবই প্রকৃতির দান বলে আমরা মেনে নিয়েছি!

মোট কথা, জীবনের সরলতা খসে গেছে। নিজেদের কদাকার মুখ ঢাকতে দিন-রাত আমরা ভণ্ডামির মুখোশ বানাই। জীবনযাপনের যত সব অ-যোগ্যতা বা অপদার্থতা ছাপিয়ে টাকা রোজগারের ঝলমলে কালো রাস্তা তৈরি করি। মনের সম্পদগুলো ফালাফালা হয়ে গেছে! চাঁচাছোলা মধ্যবিত্তরাও কীভাবে আরও বিলাস,

আরাম ও শৌখিনতায় ডুবে থাকব, ভেবে ভেবে আকুল হয়ে যাই। সৎ জীবনের ওপর লোকের ঘেন্না ধরে গেছে! আহা রে, জীবন-স্রোতের খাতের একদম তলায়, নির্মম কোনও পাথরে আমাদের হাত ঠেকেছে!

কী আর বলব—দুনিয়ার হাল-চাল দেখে, বেমালুম আঁৎকে উঠি! কে যে বন্ধু, কে শত্রু, গুলিয়ে যায়। ঘরে-বাইরে মিথ্যে আর চালাকির প্রবাল দ্বীপ বানিয়ে, তারি ওপরে পরম সুখে ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছি! সত্যিকার ন্যায়-নিষ্ঠ লোককে ঘোর সন্দেহের চোখে দেখি, পারলে টিট্‌কিরি দিই। শয়তান দেশ-নেতাদেরও করজোড়ে ডেকে আনি আমাদের শুভ কাজে। ফুর্তির চোটে বাঁচবার গণ্ডিটা ছড়িয়ে পড়ছে। কথায় কথায় বিলেত, অ্যামেরিকা, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া! হৃদয়ের গণ্ডিটা তত-ই খুদে হয়ে যাচ্ছে। কৃত্রিম পরিবেশে কেমন ছাড়া-ছাড়া, আত্মকেন্দ্রিক, বৈষয়িক জীবন! তোদের দম আটকে আসে না ? দেখিস, বেঁচে-থাকার সব মজা, সব রঙ যেন টস্‌কে না-যায়! একটাই জীবন, একটাই চান্স।

টাকা রোজগারটাই এখন বড় কথা। কোন্ পথে করলাম, কাগ-পক্ষী তো ছার—মা-বাপরাও জানতে চায় না। স্রেফ টাকা পেলেই খুশি। টাকা দিয়ে সব কেনা যায়। ক্ষমতার চেয়ার, ইশকুল-কলেজের মাস্টারি, ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র, মায় সামাজিক পুরস্কার ও সম্মান। আমাদের জীবনযাপনের সব-কিছুই এখন নম্বরে দাগানো। এক নম্বরি, দু' নম্বরি। কালো টাকা খাতির করে কালোবাজারকে টেনে এনেছে। এটা হলো হাড়-হাভাতে লক্ষ্মীছাড়াদের যুগ। কী মজা, দামামা বাজাও—আজকাল অ-সৎ হবার সুযোগ বড্ড কমে গেছে!

সত্যি সত্যি দিন-কাল খারাপ। কেন জানিস ? যদ্দিন সায়েবরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে, নিজের মাতৃভূমিকে আমরা খুব ভালোবাসতাম। এখন আর বাসি না। এমনকী নিজেদের সোনার দেশ ছেড়ে, যে-কোনও ছুতোনাতায় নানা রঙের সায়েবদের মুলুকে বাস করতে পারলে, আমরা বর্তে যাই! এভাবে কত-যে সেরা মগজ দিব্যি বেহাত হয়ে গেল! ওরে, দেশের লোকে যদি দেশের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা হারায়, তাহলে দুর্দশার কোনও সীমা থাকে না।

কোনও ঘটনাই অবিশ্যি আপনা থেকে গজায় না। সবই কার্য-কারণের গোপন সুতোয় বাঁধা। আজকের দুর্দশার বীজ গতকালের সামাজিক সৌষ্ঠবের কোলেই লুকনো ছিল। ইয়েস স্যার, গাছ বিচার করতে হলে, তার শেকড়ের কথাও ভাবতে হয়। শুধু ফুল-ফল দিয়ে হয় না। মোট কথা, ২০ শতকের দ্বিতীয় দশকে পশ্চিমে-পৃথিবী সেই প্রথম, আহা, ঘটা করে মহাযুদ্ধে মেতেছিল। স্রেফ লোভের লড়াই। একচেটে বাজার ও উপনিবেশ টিকিয়ে রাখা বা দখলের পড়ি-মরি যুদ্ধ। বাপ্ রে, অফুরন্ত টাকা বানানো আর বেপরোয়া রাজাগিরি করার জন্য, খাস্ তালুকের ন্যায্য বখ্‌রা নিয়ে মারপিট। জবর-দখলের মালিকানা নিয়ে গোলমাল। শেষকালে লুটের নতুন মাল হাতাতে গিয়ে কী কাণ্ড—ঠিক ভূতের গল্পের মতো রোমাঞ্চকর!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নিদারুণ আঘাতে, মামুলি ও পুরনো আদর্শবাদ ভেঙে-চুরে, একদম নতুন একটা মানবিকতা গড়ে উঠছিল। তখনও অনেকেই পৃথিবীর সোনালি যুগের স্বপ্ন দেখছে! ঠিক সেই সময় ওই ব্যাটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হাসতে হাসতে প্রমাণ করে দিলো—এই মানবিকতার ভিৎ বলেই কিছু নেই! ওটা তাসের বাড়ি!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনে এই ব্রহ্মাণ্ড ছারখার হয়ে গেল! সভ্যতার কী ভয়ঙ্কর লাঞ্ছনা! পৃথিবীর বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ দিব্যি কামান দেগে, বোমা মেরে, পরস্পরের সব গৌরব, সব কীর্তি মুছে ফেলার জন্য উঠে-পড়ে লাগল! যে-যার সাধ্য-মতো দাঁত ও নোখের ভেল্‌কি দেখাল। মৃত্যু আর ধ্বংসের এমন বীভৎস চেহারা মানুষ আগে দ্যাখেনি! মনুষ্যত্বের গালে ঠাস-ঠাস করে চড় মেরে, আধুনিক বিজ্ঞানের হিংস্রতা ও চালাকি ঘেঁটে গেল। বাপ্ রে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দাপটের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের দাম্ভিক চ্যালেঞ্জ! তার ওপর ডাকাতির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড। দুনিয়া-জুড়ে মহা দুঃসময় পাকিয়ে উঠল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ডেকে এনে, পিঁড়ে পেতে বসাল। সামাজিক মূল্যবোধ, দুনিয়ার অনেক পুরনো নিয়ম বেমালুম পাল্টে গেল। প্রতিষ্ঠিত মানগুলো কাচের বাসনের মতো ভেঙে পড়ল। ঝুর্-ঝুর্ করে আকাশ-কুসুমের পাপড়িগুলো খসে গেল। আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রে দালালি, চোরা-কারবার, ঘুস, কালোবাজারি—এইসব লোভনীয় জিনিস পাকাপাকি ঢুকে পড়ল। অবিশ্যি দুর্নীতি-সুনীতি বা সামাজিক-অসামাজিকের মধ্যিখানের দেয়ালটা কোথায়, আজও অনেকেই খুঁজে খুঁজে হদ্দ!

পেছন ফিরে দেখি, পশ্চিমি বণিকদের সঙ্গে মাখামাখির সুযোগে, ১৬ শতক থেকেই ভারতবর্ষের উঁচুতলার লোকেরা ব্যক্তিগত ব্যবসা করে, অফুরন্ত টাকাকড়ি বানিয়েছেন। সে-দলে ছিলেন মুগল-বাদশারা, সেইসঙ্গে রাজবাড়ির কত হোম্‌রা-চোম্‌রা! সম্রাট জাহাঙ্গিরের টুক্‌টুকে বউ নূরজাহান কেন অমন মধুর সম্পর্ক পাতালেন ওলন্দাজ, পর্তুগিজ বা ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে? কেন আবার, নিজের ব্যবসাকে রম্‌রমা বানাবার জন্য! ও-হ্যাঁ, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লক্‌লকে পকেটে কে পুরে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে চুটিয়ে ব্যবসা করার, এন্তার কুঠি বানাবার ফরমান? জাহাঙ্গির! জাহাঙ্গির!

নবাবি আমলের বঙ্গদেশে প্রায় যে-কোনও রাজকর্মচারী, পুলিশ, এমনকী বিচারপতিদেরও ন্যায্য ঘুস দিয়ে কেনা যেতো। ১৮ শতক থেকেই ভারতবর্ষে জোর-জুলুম, ঘুস, ছল-চাতুরি ও দুর্নীতির বেপরোয়া চাষ করেছে

We offer solutions to reap a golden harvest

KRISHI RASAYAN GROUP
SINCE 1956 IN AGROCHEMICALS

nettrek 04-05

KRISHI RASAYAN GROUP

F M C FORTUNA ,BLOCK NO. A-11, 4TH FLOOR 234/3A , A.J.C. BOSE ROAD, KOLKATA - 700 020

Fax : 91(033) 22471436 . E-mail : krishi.rasayan@gems.vsnl.net.in

BRANCHES :

DELHI,CHANDIGARH,LUCKNOW,JAIPUR,INDORE,MUMBAI AHMEDABAD,BANGALORE,COIMBATORE,HYDERABAD BHUBANESWAR,CUTTACK,GUWAHATI,SILIGURI, PATNA

ইংরেজরা। ভুলে যাস্ না, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জমানা থেকেই ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের তাল তাল সোনা অনবরত পাচার করেছে নিজেদের দেশে! ১৯০ বছর ধরে ভারতীয় প্রজাদের খাজনার টাকাতেই দিন-রাত এখানে ফুটুনি মেরেছে বিলিতি দস্যুরা। ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশ চালানো, যুদ্ধ-টুদ্ধ, আমোদ ও আহ্লাদ, সব-কিছু! গরিব ভারতবাসীর হাড়-ভাঙা খাট্‌নির টাকায় হরদম ফুর্তি হয়েছে ইংল্যান্ডে। মনে রাখিস, ১৭৭০ দশকে ইংল্যান্ডের রাজশক্তি ও বণিকশক্তি মিলেমিশে রাক্ষস-খোক্কস বনে যেতেই, দুনিয়ার ভোল পাল্টে গেল। ব্রিটিশ-ভারতে সরকারি আমলা, পুলিশ ও বিচারপতিরা সারাক্ষণ ঘুস খেতো।

হিসেব নিয়ে দ্যাখো—আজ পর্যন্ত মানুষের গড়া সভ্যতার সেরা কীর্তিগুলো অপদার্থ মানুষ-ই নষ্ট করেছে বেশি। হাজার চেষ্টা করেও, প্রকৃতি অতটা পারেনি! মৌলবাদী শয়তানরা, দাম্ভিক যুদ্ধবাজরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে নানা দেশের শিল্প-সংস্কৃতি। হাজার বছরের আশ্চর্য সৃষ্টি—ধসে গেল এক মুহূর্তে!

যে-কোনও দেশের সামাজিক ও নৈতিক দুর্দশার মূলে থাকে অ-শিক্ষা। মূর্খতা থেকেই যতরকম কু-সংস্কার, কু-প্রথা ও দারিদ্রের জন্ম। মূর্খতা না-ঘুচলে, বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে দুনিয়া দেখার চোখ ফুটবে কেমন করে ? এমনকী নিজের পরিচয়কে দেশবাসীর পরিচয়ের সঙ্গে না-মেলালে, কোনও মানুষের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। হ্যাঁ-গা, জানলার খড়খড়ি দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডকে কতটুকু দেখা যায় ?

পৃথিবীতে করবার যোগ্য কাজ তো ওইটুকুই, যা আমরা অন্যের জন্য করতে পারি। দুনিয়া-জুড়ে যারা দারিদ্রসীমার নীচে পড়ে আছে, তারাও যে স্বপ্ন দ্যাখে, আশায় বুক বাঁধে! প্রাণ ছাড়া, স্বপ্ন ছাড়া কেউ বাঁচে ? অবিশ্যি আগে পেটের খিদে মেটাতে হয়, তবে-না মনের পাখি ডানা মেলবে! যে-ব্যাটা নিজের মাতৃভাষাকে, নিজের দেশের সংস্কৃতি ও মন-মেজাজকে তাচ্ছিল্য করে, সেই হতভাগার জন্য দুঃখ হয়। মোট কথা, অ-যোগ্য বা মন্দ কিছুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে নেই। ছাপোষা, সাধারণ লোকেরাই যে-কোনও দেশের সাহস এবং শক্তির সবচাইতে জোরালো খুঁটি।

সামাজিক আন্দোলন বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার রাস্তা থেকে, আমাদের হটিয়ে দিচ্ছে কে ? দুষ্কৃতকারীদের সহ্য করা, এমনকী ত্যানাদের তোয়াজ করার পাঠ কে দিচ্ছে ? কে আবার, পার্থিব সুখ ও সাফল্যের স্বার্থপরতা! সংসারের খুদে গণ্ডি ছাপিয়ে, গোটা মানুষ হবার চেষ্টা করি ক' জন ? ইশকুল-কলেজের তোতাপাখির বুলি ছ্যা-ছ্যা—আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে ধারালো করবে কীভাবে ? তাই তো জাত-পাত ও ধর্ম নিয়ে ব্যবসার কী বোলবোলা! ডাক্তারবাবু বা মাস্টারমশাইরাও এখন মুদির দোকান চালাচ্ছেন!

শোন্, সারাক্ষণ নিজের স্বার্থে মজে থাকে বদমাইশ আর কাপুরুষরা। কোনও মানুষের মান এবং হুঁশ্ থাকলে, মানবসমাজের স্বার্থটা তাঁকে দেখতেই হয় । ভিতুদের কিছু লোক ঘেন্না করে, বাকিরা আরও ভয় দেখায়। ভয় দেখানোটাও একটা ব্যবসা। ঝলমলে, চিরকেলে ব্যবসা! তাছাড়া শুধু বাইরের শত্রুদের চিনলে হবে না। নিজের মধ্যেও নিজের শত্রুকে খুঁজতে হয়। বুকের ভেতরে অফুরন্ত রসের উৎস না-থাকলে, দুনিয়া দেখার চোখ পাবি কোত্থেকে ? হ্যাঁ-রে, দেশাত্মবোধ মানে জানিস ? দেশকে নিজের সমান করে দেখা।

রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করার নৈতিক সাহসটুকু হারিয়ে ফেলিস না। কিশোর এবং যুবকরাই দেশের সবচাইতে জোরালো মূলধন। গোড়ায় আত্মীয়স্বজন ও চেনা লোকেরা ঘুস খেলে বা ঘুস দিলে, কিম্বা এতটুকু ভণ্ডামো বা দুর্নীতি করলে, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে টিট্‌কিরি দে। এভাবে মন পাকিয়ে, তারপর যাবতীয় পিছু-টান, ঘেন্না বা ভয়-টয় সটাং ঝেড়ে ফেলে—যেভাবে যতটুকু পারিস—নিষ্ঠুরতা বা অন্যায় দেখলেই, রুখে দাঁড়া। দরকার হলে ছুটে যেতে হবে, বিপদে ঝাঁপাতে হবে। আমরা যে অ-বিদ্যের কবলে পড়েছি! অ-বিদ্যে! ওটা মূর্খতার চেয়েও সাংঘাতিক! এই-যে ভারতবর্ষের জল-মাটি-হাওয়ায় আমরা যুগ যুগ ধরে মানুষ হচ্ছি, এই দেশটা আমাদের সব মায়ের পরম মা। যে-দেশের ছেলেপুলেরা এই মাতৃ-ঋণের কথা ভাবে না, সে-দেশের কপাল মন্দ!

বলি কী, যুক্তি আর বুদ্ধির আলোয় নিজেদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সাদা চোখে খুঁজে নাও। মগজ আর মন পাকাতে, প্রকৃতি ও জীবন-চেতনার তালিম নিতে হবে। সুন্দরকে চিনতে শেখো। মহা শক্তিশালী বদমাইশ কিম্বা বেপরোয়া হীরক রাজাকেও—আহা, মাটিতে বিছিয়ে দিতে পারে সাধারণ মানুষের অফুরন্ত সাহস আর শক্তি!

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়। অলঙ্করণ : সমীর সরকার

অরূপ ও বভ্রবী মণ্ডল

একটু আগেই টুবাই মায়ের সঙ্গে এসে পৌঁছেছে। মুন্নিদিদিরা সকালেই এসেছে। কাল পয়লা বৈশাখ। দাদুন আর দিদানকে প্রণাম জানাতে সবাই একে একে হাজির হচ্ছে। রাতে অফিস থেকে বাপিও আসবে।

কিন্তু দাদাভাই কোথায় ?

মুন্নিদিদি বলল, 'সকাল থেকেই শুনছি স্টাডি-রুমে আছে। দুপুরে খাবার সময় এসেছিল, এখন আবার দরজা বন্ধ।'

'পড়াশোনা করছে ? সামনে পরীক্ষা ?'

মুন্নিদিদি টুবাইয়ের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'সবাই ভাবছে পড়ছে। আমি কিন্তু পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখেছি—কম্পিউটার-গেম খেলছে।'

টুবাই ক্লাস ফোর-এ উঠবে, মুন্নিদিদি সিক্স-এ। স্কুলের দৌলতে কম্পিউটার দু'জনেই দেখেছে।

কতক্ষণ আর এ-ঘর ও-ঘর করা যায় ? টুবাই শেষে মুন্নিদিদিকে বলেই ফেলল, 'চল না, ট্রাই করে দেখি। দাদাভাই যদি স্টাডিতে একটু ঢুকতে দেয় !'

'চল তাহলে—'

স্টাডির দরজায় হালকা চাপ দিতেই, দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল। দাদাভাই কম্পিউটার-স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল, 'আয়, ভেতরে আয়।'

টুবাই মুন্নির উৎসাহ আর ধরে না।

টুবাই চোখ বড় বড় করে কম্পিউটারের রঙিন পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে।

দাদাভাই বলল 'কম্পিউটার। চিনিস ?'

টুবাই ঘাড় নাড়ে। স্কুলে কম্পিউটার-রুমের কাচের দরজা দিয়ে ভেতরটা দেখা যায়।

'আচ্ছা বল তো, কোনটা কম্পিউটার ?'

টুবাই ভাবে, কী অদ্ভুত প্রশ্ন ! আঙুল তুলে টেবিলে বসানো টিভি-র মতো দেখতে সাদা রঙের জিনিসটাকে দেখায়।

দাদাভাই তো হেসে খুন।

'ধ্যাৎ ! ওটা তো মনিটর। কম্পিউটারের কাজকর্ম ওই মনিটরে ফুটে ওঠে, যাতে আমরা দেখতে পাই।...বোস এখানে।'

মুন্নি টুবাই চুপচাপ ছোট্ট কাঠের গদি-আঁটা চেয়ারটায় ঠাসাঠাসি করে বসে পড়ল। টুবাইয়ের কানদুটো একটু লাল হয়েছে।

'দ্যাখ, মনিটর ছাড়া বাইরে থেকে আর দেখছিস এই কী বোর্ড এবং মাউস। এ-দুটো দিয়ে আমরা কম্পিউটার চালাই। তাই সবার আগে এ-দুটো ব্যবহার করতে শিখতে হবে। মুন্নি তো এবার সিক্স-এ উঠবি, কম্পিউটার-ক্লাস আছে তোদের ?'

'আছে তো।'

'কম্পিউটার কাকে বলে ? কম্পিউট করে যে। সোজা কথায়, হিসেবনিকেশের যন্ত্র। প্রথমে কম্পিউটার তৈরি হয়েছিল অঙ্কের হিসেবনিকেশ—জটিল সমস্যা সহজে আর তাড়াতাড়ি সমাধান করার জন্য। এই-যে রঙিন ছবি দেখছিস, তখন এমনটা হত না। কালো স্ক্রিনে সাদা সাদা কিছু লেখা—কম্পিউটারের ভাষা বা কম্পিউটার-ল্যাঙ্গুয়েজে সব কাজ করা হত। তখন ছোটদের পক্ষে কম্পিউটার চালানোটা ছিল প্রায় অসম্ভব। আর এখন টুবাইয়ের থেকেও ছোট ছেলেপুলেরা খুব সহজে, খুব ভালোভাবে কম্পিউটার চালাতে পারে।'

'কিন্তু ভালোভাবে কম্পিউটার চালাতে গেলে, এই যন্ত্রটাকেও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।' মুন্নিদিদি বলে উঠল।

'ঠিক বলেছিস। শোন তবে...কম্পিউটারের দুটো দিক। হার্ডওয়্যার এবং সফ্‌টওয়্যার। এই মনিটর, কী-বোর্ড, মাউস —এরকম আরও কিছু যন্ত্রাংশ দিয়ে কম্পিউটারের কাঠামোটা তৈরি। এগুলোই কম্পিউটার হার্ডওয়্যার।'

'আর সফ্‌টওয়্যার ?' টুবাই জানতে চাইল।

'একটু বাদে বলছি। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নিয়ে আরও দুটো-একটা কথা বলা দরকার। আচ্ছা, বাইরে থেকে আর কী কী দেখতে পাচ্ছিস ? ওই যে ওটা প্রিন্টার—কম্পিউটারে করা লেখাপত্তর, হিসেবনিকেশ বা ছবি কাগজে ছেপে বার করার জন্য। এছাড়া কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা গান শুনতে পারি, সিনেমা দেখতে পারি, গেম খেলতে পারি। তাই মনিটরের পাশে ওই স্পিকার-দুটো। এবার নীচের বাক্সটার দিকে তাকা। আলাদা করে বললে, ওই বাক্সটা হচ্ছে ক্যাবিনেট। কম্পিউটারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ওতে পোরা আছে। পরে একদিন ক্যাবিনেট খুলে সব আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দেবো।'

দাদাভাই বেশ উৎসাহিত হয়ে পড়েছে। মুন্নি টুবাই টানটান।

'ক্যাবিনেটের মধ্যে যা-কিছু যন্ত্রাংশ আছে, তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হার্ডওয়্যার হচ্ছে সি পি ইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। মনে কর, টুবাইকে যদি প্রশ্ন করা হয়, চার দু'-গুণে কত হয় ? টুবাইয়ের মুখ উত্তর দেবে আট। গুণটা কিন্তু করল

ওর মাথা। ঠিক তেমনি কী-বোর্ড দিয়ে লিখে কম্পিউটারকে ওই গুণটা করতে দিলে, মনিটারে উত্তর ফুটে উঠবে : '৮'। কিন্তু গুণটা করল কে ? কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এই কাজটা করে এই সি পি ইউ। তাই এটাকে বলা যায় কম্পিউটারের ব্রেন।'

'মগজাস্ত্র!' ফুট কাটল টুবাই।

'মজার কথা কী জানিস—আমরা কম্পিউটারে যা-ই করি—গেম খেলি, ছবি আঁকি, লেখালেখি করি অথবা নানারকম হিসেব কষি—এ-সবই কম্পিউটারের কাছে একটা বিশেষ ধরনের অঙ্ক। এই অঙ্ক কষার প্রক্রিয়াটাকে কম্পিউটারের ভাষায় বলা হয় প্রসেসিং। এই প্রসেসিং-ই কম্পিউটারের প্রধান কাজ। এই কাজটা করে সি পি ইউ। যে-কোনও কাজ করতেই কম্পিউটারকে জটিল সব গণনা করতে হয়। তাই সি পি ইউ সারাক্ষণ শুধু এই গণনা করে চলে। ব্যাপারটা পরে তোদের বুঝিয়ে বলব।'

'এখনকার একটা কম্পিউটার কতটা দ্রুত কাজ করে?' মুন্নিদিদি জিজ্ঞেস করল।

'আধুনিক কোনও কম্পিউটার সি পি ইউ এক সেকেন্ডে কয়েক বিলিয়ন জটিল গণনা সেরে ফেলতে পারে। বিলিয়ন বুঝিস? এক বিলিয়ন-এর অর্থ একশো কোটি। অথচ এই সি পি ইউ-ই হল কম্পিউটারের যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে সবথেকে ছোট। এটা চারকোনা, একপিঠে কাঁটা-কাঁটা দেখতে, ছোট্ট একটা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার।'

টুবাই বলে উঠল, 'আচ্ছা দাদাভাই, মানুষের মগজের সঙ্গে কম্পিউটার-মগজের তফাৎটা কোথায়?'

'মুল তফাৎ হল—কম্পিউটার-ব্রেন অতি দ্রুত সব কাজ করলেও, কিছুই মনে রাখতে পারে না। কিন্তু কিছুই যদি মনে না-থাকে, তাহলে এই গণনার যে ফলাফল—তা আমাদের কাছে পৌঁছবে কী করে? এই মনে রাখার জন্য কম্পিউটারে আলাদা কতকগুলো যন্ত্রাংশ আছে। এটা হচ্ছে মেমরি সেকশন। কম্পিউটারের মেমরি দু' ধরনের—প্রাইমারি মেমরি এবং সেকেন্ডারি মেমরি।'

কাগজ-কলম নিয়ে দাদাভাই একটা ডায়াগ্রাম আঁকতে বসল। দুই ছাত্রছাত্রী ঝুঁকে পড়ে তার ওপর।

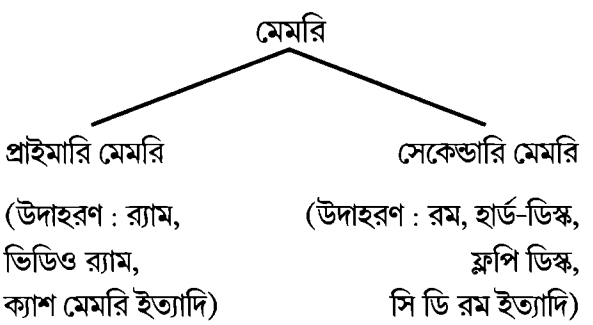

কাগজটা টুবাইয়ের হাতে দিয়ে দাদাভাই বলল, 'প্রাইমারি মেমরি প্রধানত কম্পিউটার চলাকালীন কাজ করে। র‍্যাম বা র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমরি এক্ষেত্রে বড্ড গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখন কম্পিউটার চালাই, তখন সি পি ইউ অনবরত ডাটা বা তথ্য প্রসেস করে। এইসময় যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সি পি ইউ র‍্যামের মাধ্যমে আদানপ্রদান করতে থাকে।'

'আর সেকেন্ডারি মেমরি?' টুবাই জিজ্ঞেস করল।

'সেকেন্ডারি মেমরি হচ্ছে কম্পিউটারের ভাঁড়ারঘর। সব মালপত্র এর মধ্যে গচ্ছিত আছে, পাকাপাকিভাবে। এমনকী যখন কম্পিউটার চলছে না, তখনও। এজন্যে এদেরকে বলে স্টোরেজ ডিভাইসেস। হার্ড-ডিস্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেকেন্ডারি মেমরি। আচ্ছা বল তো, কী থাকে কম্পিটারের ভাঁড়ারঘরে?' দাদাভাই গম্ভীরভাবে তাকায় টুবাইয়ের দিকে।

'সফ্‌টওয়্যার!' টুবাই জবাব দেয় আন্দাজে।

'ভেরি গুড। এই সফ্‌টওয়্যার ছাড়া আমাদের নিজেদের করা কাজকর্মও আমরা হার্ড-ডিস্কের মধ্যে জমিয়ে রেখে দিই ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু সে-কথায় পরে আসা যাবে। আগে এই সফ্‌টওয়্যারের বিষয়টা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। কেননা সফ্‌টওয়্যারই কম্পিউটারের প্রাণশক্তি।'

'বটে!' মুন্নিদিদি বলে উঠল।

'দ্যাখ মুন্নি, কম্পিউটার চালানো ব্যাপারটার দুটো দিক। একটা হচ্ছে কম্পিউটার যন্ত্রটাকে নিয়ন্ত্রণ করা। এবং দুই, কম্পিউটারের মাধ্যমে নানারকম কাজ করা। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা কতরকম কাজ কত সহজে, তাড়াতাড়ি এবং নিখুঁতভাবে করতে পারি। কিন্তু সমস্যা হল, সেগুলো করতে গেলে আমাদের কম্পিউটার যন্ত্রটাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কাজটা কিন্তু আমরা—ব্যবহারকারীরা—সরাসরি করি না। অপারেটিং সিস্টেম নামক এক ধরনের সফ্‌টওয়্যার দিয়ে আমরা কাজটা করি।'

কান খাড়া করে শুনছিল টুবাই, মুন্নি। টুবাই জুলুজুলু চোখে তাকিয়েছিল দাদাভাইয়ের ডানহাতে ধরা মাউসটার দিকে। এতক্ষণে দেখে নিয়েছে দু'দিকে দুটো বাটন, মাঝখানে একটা ছোট্ট চাকা লাগানো।

দরজার বাইরে থেকে দিদুনের গলা শোনা গেল, 'অ্যাই নীলু, টুবাই-মুন্নি ঘুমিয়ে পড়েনি তো? ওদের নিয়ে খেতে এসো।'

নামাঙ্কন : সমীর দাশ

দাক্ষিণাত্যের দাক্ষিণ্য

সব্যসাচী চক্রবর্তী

বছরে দু'-তিনবার জঙ্গলে বেড়াতে না-গেলে, কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়ি। কাজে মন বসে না, অকারণে মুখটা গম্ভীর, হজমশক্তি কমে যায়, অসুস্থ বোধ করি। মে মাসে সদলবলে গরুমারা, চাপরামারি, শুল্কাপাড়া যাওয়া হয়েছিল। তাই পুজোর সময় ঠিক করলাম বান্দিপুর, নাগারহোলে, মুদুমালাই যাবো। আমার গিন্নির খুব ইচ্ছে ছিল যাওয়ার, কিন্তু দুই পুত্র বলল, 'পুজোর সময় কলকাতা ছেড়ে যাবো না।' অগত্যা গিন্নিও বাদ। বন্ধুদের নিয়ে দল পাকালাম। চিত্রভানু বসু, রাজদীপ ঘোষ, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। একটা টাটা সুমোতে চারজন। দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে যাওয়া।

একেবারে পেছনের দুটো আড়াআড়ি সিটের মধ্যিখানে আমাদের ব্যাগগুলো রেখে, তার ওপর তোষক পেতে শোবার জায়গা করে নেওয়া হল। গাড়ির ছাদে লাগেজ কেরিয়ার-এ দুটো স্পেয়ার চাকা তুলে দিলাম। একটা ছোট পাইপ-লাগানো খাবার জলের ট্যাঙ্ক বসানো হল। সেইসঙ্গে চারটে ফগলাইট এবং দুটো স্পটলাইট লাগিয়ে, এবার চটপট বেরিয়ে পড়া। ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ছ'টায়। বান্দিপুর আর নাগারহোলে ঘর-বুকিং হয়ে গেছে, আমাদের ব্যাঙ্গালোর-নিবাসী বন্ধু অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী কাকলির সৌজন্যে।

সকাল আটটায় কোলাঘাটের 'শের-এ পাঞ্জাব' ধাবা-তে রুটি, ডাল, ডিমভাজা। ঠিক করলাম—খড়্গপুর হয়ে, কাঁথি হয়ে, সোজা বালাসোর যাবো। বহরাগোড়া হয়ে যেতে গেলে ৬০ কিলোমিটার বেশি পড়বে। তো খড়্গপুর-মেদিনীপুরের মোড় থেকে বাঁ-দিকে

ঘুরে গেলাম। এক সর্দারজি ট্রাক-ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করা হল, 'এদিকের রাস্তা কেমন ?' তিনি বললেন, 'বড়িয়া হ্যাঁয়।'

জায়গায় জায়গায় রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে। তাই খোঁড়াখুড়ি চলছে। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে ধীরে চালানো, কখনও ভালো রাস্তা পেয়ে গতি বাড়ানো। শেষমেশ যখন বালাসোর পেরোলাম, দেখলাম সময় কিছুই বাঁচাতে পারিনি। ওড়িশা ঢুকতেই অবিশ্যি আমাদের থেকে তিনশো দশ টাকা ট্যাক্স নিয়ে নিল! বলল, 'ভ্যালিড ফর সিক্স মান্থস।' কোনও রাজ্যে এভাবে প্রাইভেট গাড়ির ট্যাক্স নেওয়া হয় না।

রাত ন'টা নাগাদ চিলিকা লেক্-এর বারকুল পান্থনিবাস-এ দু'খানা ঘর নিয়ে রাতের খাওয়া ও বিশ্রাম। আমি চিংড়ি বা কাঁকড়া খাই না। ছোটবেলায় অ্যালার্জি ছিল, তখন থেকেই এড়িয়ে চলি। কিন্তু চিত্রভানু, রাজদীপ আর সুবীর খুব রসিয়ে রসিয়ে চিংড়ি ও কাঁকড়ার ঝোল খেয়ে, খোশমেজাজে ঘুমোতে গেল।

পরদিন সকাল সাতটার আগেই বেরিয়ে পড়া। ঘণ্টা দুয়েক বাদে শুধু অন্ধ্র-বর্ডারে মিনিট ৪৫-এর জন্যে দাঁড়ানো হল, পেট ভরে খেয়ে নেওয়ার জন্যে। ব্যস, সোজা বিশাখাপত্তনম্ গিয়ে থামলাম চারটে নাগাদ। আবার খানিক পেটপুজো, তারপর আবার চলা। ইচ্ছে ছিল রাত দশটার মধ্যে বিজয়ওয়াডা ঢোকার, কিন্তু থেকে থেকেই এমন খারাপ রাস্তা—গতি বাড়ানো গেল না। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় একটা টায়ার পাংচার হল। সেটা সারাতে প্রায় এক ঘণ্টা! অবশেষে বিজয়ওয়াডার এক গলির ভেতর একটা সস্তা হোটেল পেয়ে গেলাম, রাত বারোটায়।

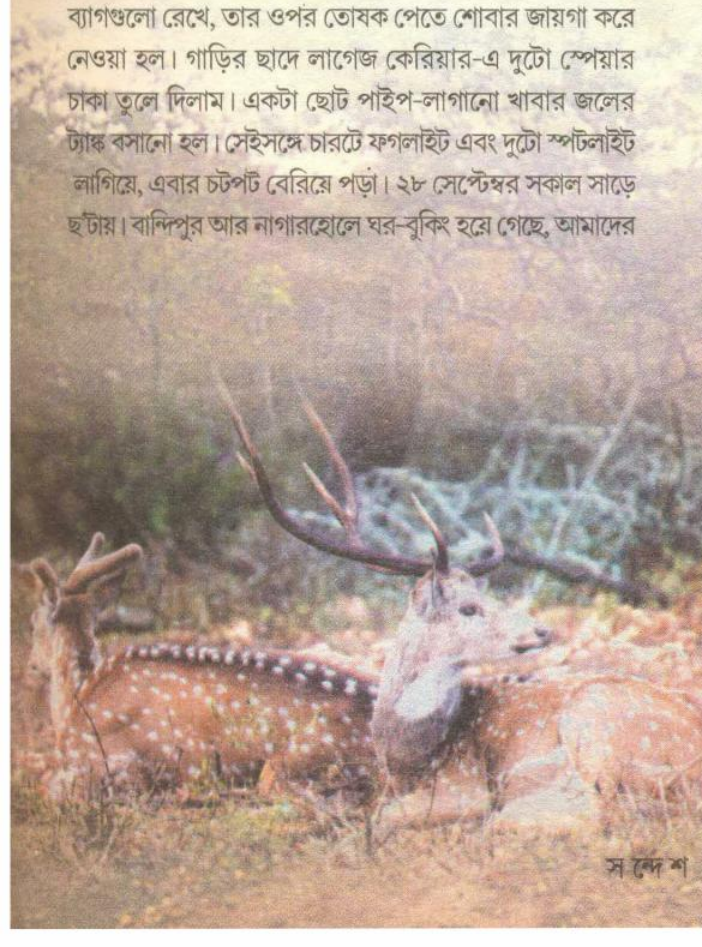

ময়ূর। নাগারহোলে

সারসেরা (ঈগরেট)। বান্দিপুর

সাদা আইবিস। রঙ্গনাথিত্তু

বুনো কুকুর। নাগারহোলে

মা ও শিশু-বাঁদর। বান্দিপুর

পরদিন সকাল সাতটায় আবার রওনা। বেলা এগারোটায় অঙ্গোল্-এ ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ একসঙ্গে 'ব্রাঞ্চ' হিসেবে সেরে, তিরুপতি পৌঁছে গেলাম বিকেল চারটেয়। রাত ন'টায় প্রচণ্ড খিদে পাওয়ায় 'লক্ষী-সাগর' বলে একটা জায়গায় ডিনারটা সেরে ফেলা হল। রাত ১১টার মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে অনির্বাণের বাড়িতে আমরা হাজির। গাড়ির ওডোমিটার বলছে : ১৯৯৫ কিলোমিটার গেছি কলকাতা থেকে।

সকাল ন'টায় ঘুম ভাঙল। দু'-হাজার কিলোমিটার গাড়ি চালিয়েছি, চিত্রভানু আর আর আমি পালা করে। ক্লান্তি তো হবেই। শ্রীমতী কাকলি আমাদের চা-জলখাবার দিল, এবং নিজে তৈরি হয়ে, ছেলে 'নীল'কেও তৈরি করে নিল। বেলা ১১টায় ব্যাঙ্গালোর থেকে বেরিয়ে, সাড়ে ১২টায় 'মাদুর' বলে একটা ছোট-টাউনে লাঞ্চ সেরে, বিকেল পাঁচটায় পৌঁছে গেলাম বান্দিপুর ব্যাঘ্র-প্রকল্পে। বুকিং-ফরম দেখাতে আমাদের তিনটে ঘর খুলে দিল। নাম 'বনশ্রী'। সেখানে গোটা পাঁচেক ঘর। একটা কিচেন, একটা ডাইনিংরুম, দুটো বসার লবি। রাজদীপ আর আমি একটা ঘরে, চিত্রভানু ও সুবীর নিল একটা এবং অনির্বাণ, কাকলি ও নীল ঢুকে পড়ল তিন নম্বর ঘরে।

চারদিকে খোলা মাঠ, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রচুর বড় বড় গাছ। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেশ লাগছিল। নির্দেশ পেলাম—সন্ধ্যে হওয়ার আগে গাড়িটা মেন অফিসের সামনে কার পার্ক-এ রেখে আসতে হবে। সেটাই নিয়ম। তারপর পাশের ক্যান্টিনে চা আর

বিস্কুট খেলাম। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানলাম জঙ্গলে বেড়ানোর জন্যে বাস আছে, মাথাপিছু ৩৫ টাকা। আর গাইড-চার্জ ইত্যাদি মিলিয়ে ৫০ টাকা মতো খরচা। কিন্তু এক বাসে অত লোক থাকলে চ্যাঁচামেচি হবেই, জন্তু-জানোয়ারও পালিয়ে যাবে। ছবি তোলা হবে না। তাই আমি আর অনির্বাণ সোজা ডি এফ ও-র অফিসে চলে গেলাম।

ডি এফ ও ইতেশ কুমারকে আমাদের ব্যাপারটা বোঝালাম। তিনি আমাদের নিজেদের গাড়িতে ঘোরার অনুমতি দিলেন। সেইসঙ্গে গিরিশ নামে এক গাইড-ভদ্রলোককে আমাদের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। আমাদের একটা টেপ-রেকর্ডার এবং মাইক্রোফোন ছিল। সেটাতে নানারকম শব্দ রেকর্ড করার পরিকল্পনা, অনেক লোকজনের সঙ্গে গেলে, সেটাও সম্ভব হত না।

পর পর দু' দিন ঘোরা হল বান্দিপুরের জঙ্গলের ভেতরে। কত-না চিতল হরিণ, সম্বর, একটা হগ্ ডিয়ার, অনেক লঙ্গুর ও বাঁদর, কয়েকটা বুনো শুয়োর, বেজি এবং নানা ধরনের পাখি ও পোকামাকড় পেলাম। পাখির মধ্যে প্রধানত ময়ূর, বুলবুল, কাঠঠোকরা, ওয়্যাগটেল, জাঙ্গল ব্যাবলার, ব্লু-জে (নীলকণ্ঠ পাখি) পেলাম। পোকার মধ্যে প্রজাপতি, ড্রাগনফ্লাই, গুবরে পোকা।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে মুদুমালাই বেড়াতে যাওয়া হল। মুদুমালাই হচ্ছে তামিলনাড়ুর জাতীয় উদ্যান। ওখানেও সেই বাসে ঘোরা। রেঞ্জ অফিসার আমাদের গাড়ি নিয়ে ঘোরার অনুমতি দিতে পারলেন না। বললেন, ' চেন্নাই থেকে পারমিশন আনতে হবে।' তাই শুধু বাইরে দিয়ে এক চক্কার মেরে, উটির রাস্তায় গিয়ে আবার ফিরে এলাম। কিছু হাতি, লঙ্গুর, বাঁদর, শুয়োর ও পাখি দেখা গেল।

ফেরার পথে হঠাৎ একপাল হাতি! রাস্তার বাঁ-দিকে পাঁচটা বড় হাতি, সঙ্গে গোটাতিনেক ছোট। আমি মনের সুখে ছবি তুলতে লাগলাম। হঠাৎ ওরা রাস্তা পার হতে লাগল। আমি গাড়ি থেকে নেবে একটার পর একটা ছবি তুললাম। তারপর জুম-লেন্স পালটে ওয়াইড-লেন্স লাগিয়ে হাতির পালের পেছনে ধাওয়া করলাম—কাছ থেকে ছবি নেব বলে। হঠাৎই আমার ফিল্ম শেষ! আর ঠিক তখনই আমার ডানদিকে একটা বিশাল ঝোপের ওপর থেকে এক বিরাট হাতির মাথা, দুটো কান, দুটো পাঁচ ফুট লম্বা দাঁত এবং একটা শক্তিশালী শুঁড়ের উদয় হল। সেইসঙ্গে ইলেকট্রিক ট্রেনের মতো একটা হর্ন বাজাল পুরুষ হাতিটা। আমি যত জোরে গিয়েছিলাম, তার থেকেও জোরে দৌড়ে গাড়ির কাছে ফিরে এলাম! হয়েছে কী, দিদি-বৌদি-মাসিমারা যখন রাস্তা পেরোচ্ছিলেন কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে, তখন থেকেই মেসোমশাই যে আমাদের ওপর নজর রেখেছিলেন, সেটা খেয়ালই করিনি। হঠাৎ বেকায়দায় তাঁর সামনে পড়ে গেলে, কান ধরে ওঠ-বোস করে বলতে হত, 'অন্যায় হয়ে গেছে মেসো, আর করব না!' তিনি শুধু একটা 'আঃ!' বলে আমাকে এবারের মতো তাড়িয়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ দিন বান্দিপুরকে বিদায় জানিয়ে নাগারহোলে চলে গেলাম। অনির্বাণ ওখানে আমাদের জন্যে একটা ১২ বিছানার ডর্মেটরি বুক করে রেখেছিল। ওখানে মোটামুটি দুপুর দুটোয় পৌঁছে ডাল-ভাত-তরকারি পাওয়া গেল। বিকেল চারটেয় বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি পেলাম নিজেদের গাড়িতে, কিন্তু টুরিস্ট জোন-এর বাইরে যেতে দিলেন না কর্তৃপক্ষ। বললেন, 'এখানে ভিরাপ্পান-এর দৌরাত্ম্যে আমরা তটস্থ!' অতএব কয়েকটা নিরীহ রাস্তা দিয়ে আনাগোনা হল। ময়ূর, হরিণ, বাঁদর আর প্রজাপতি দেখেই যতটা মন ভরানো যায় আর কী!

ডর্মেটরিতে ফিরে এসে ঠিক করলাম ব্যাঙ্গালোর ফেরা যাক। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা দিলাম হন্সুর-এর দিকে। অবিশ্যি নাগারহোলের বাইরের গেট পেরোনোর আগে হঠাৎ সাত-আটটা বুনো কুকুরের দল পেয়ে গেলাম। বেশ কয়েকটা ছবিও পেলাম। তারপর হন্সুর হয়ে মাইসোর, সেখান থেকে শ্রীরঙ্গাপটনম্। রাস্তায় পড়ল 'রঙ্গনাথিত্তু পক্ষীরালয়'। ওখানে থেমে নৌকোয় মিনিট কুড়ি ঘোরা হল। পেলাম অসংখ্য হোয়াইট আইবিস, ঈগরেট, হেরোন। এবং জলে কুমির। গাছে বাদুড়ও পেলাম। ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছলাম বিকেল পাঁচটা নাগাদ। সন্ধেবেলা আড্ডা হল। গল্প হল। মেসোমশাইয়ের 'তাড়া' নিয়ে হাসাহাসি করলাম।

পরদিন ব্যাঙ্গালোরে সারাদিন কাটিয়ে, ৭ অক্টোবর কলকাতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ভুল করে হোসুর রোডে ঢুকে পড়ে আবার গাড়ি ঘুরিয়ে, মাঝখানের এক গ্রামের রাস্তা ধরে আমরা এসে পৌঁছলাম হোস্কোট্-এ। সেখান থেকে চিত্তুর-এর রাস্তা ধরে, তিরুপতি হয়ে নেল্লোর-এর কাছে পেট ভরে খেয়ে নিলাম। তারপর চিত্রভানু গাড়ি চালাল। বিজয়ওয়াডা পৌঁছে গেলাম রাত সাড়ে দশটায়। রাতে একটা হোটেল-ঘরে রয়ে গেলাম।

পরদিন সকাল সাতটায় বেরিয়ে, বিশাখাপত্তনম্ দুপুর দুটোয়। রাত সাড়ে দশটায় চিলিকা লেকের ধারে 'রম্ভা পান্থনিবাস'-এ। ৯ তারিখ সকাল ন'টায় ব্রেকফাস্ট সেরে, বেরোলাম সাড়ে ন'টায়। কটক সাড়ে বারোটায়, বারিপদা বিকেল পাঁচটায়। এক ঘণ্টার খাওয়া-দাওয়ার হল্ট্। তারপর আবার চিত্রভানুর হাতে স্টিয়ারিং হুইল, রাত এগারোটায় কলকাতা।

এইরকম বেড়ানোর মজা শুধু আমার বা চিত্রভানুর, রাজদীপ বা সুবীরের নয়। যারা গাড়িতে বেড়াতে ভালোবাসে, সকলেরই। রাস্তার দু'ধার দিয়ে কত গ্রাম-শহর, খেত-খামার, কত মন্দির-মসজিদ, পান্থশালা, কত দোকানপাট, কত লোক কত কাজে ব্যস্ত, কত নদী-নালা-পাহাড়, কত গরু ছাগল কুকুর বেড়াল, কত লরি বাস গাড়ি ট্রেন! আমাদের

জাতীয় সড়কগুলো এখন আধুনিকভাবে তৈরি হচ্ছে। শেষ হলে আন্তর্জাতিক মানের হবে। এবার ব্যাঙ্গালোর যেতে তিনদিন লাগল, সেদিন হয়তো একদিনেই যাওয়া যাবে, বড়জোর দেড়দিন।

ব্যক্তিগতভাবে আমার গাড়ি চালাতে বড্ড ভালো লাগে। আমি আর চিত্রভানু এইভাবে আমাদের টাটা সুমোতে দেশের কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, তার হিসেব করলে বোধহয় পৃথিবীটা এক চক্কর মারার মতন হবে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ধাবায় খাওয়া। ঝড় জল বৃষ্টি রোদ উপভোগ করা। গাড়িকে চান করানো,

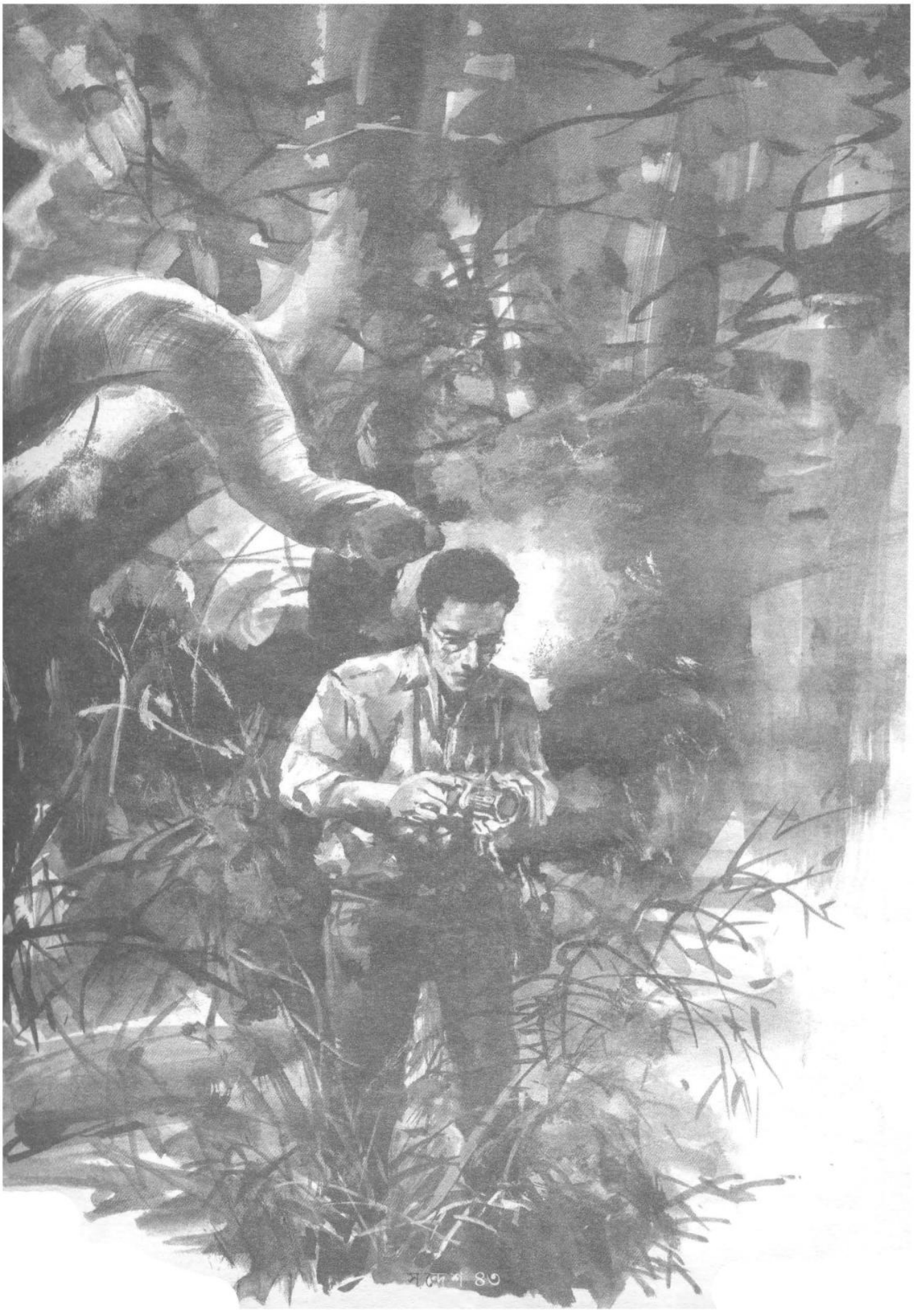

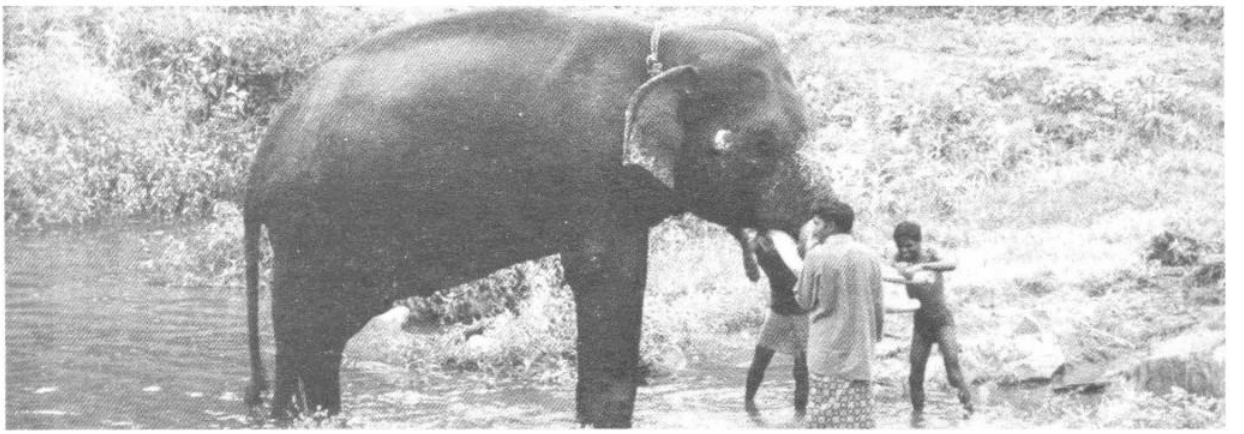

পোষা হাতিকে চান করানো হচ্ছে। মুদুমালাই

ধোয়া-মোছা। এ-সবের মজাই আলাদা। এইভাবে লং-ডিস্টেন্স গেলে চিত্রভানু আর আমি অর্ধেক অর্ধেক চালাই। প্রচুর চা খাই। ছবি তুলি। গান গাই, গান শুনি। শব্দ রেকর্ড করি। এমন এক রোমাঞ্চ অনুভব করি, যেটা বলে বোঝাতে পারব না।

এবার কয়েকটা তথ্য পেশ করা যাক।

(১) মোট রাস্তা : ৪৯৬০ কিলোমিটার।

(২) গাড়ি : টাটা সুমো (এ সি ও টার্বো-চার্জড্ লাগানো)।

(৩) ড্রাইভার : দু'জন।

(৪) মোট ডিজেল : ৪৩০ লিটার।

(৫) গড় : ১১.৫৩ কিলোমিটার প্রতি লিটার।

(৬) রুট : কলকাতা-খড়্গপুর-বালাসোর-কটক-চিলিকা লেক (২৮/৯)। চিলিকা-আন্নাকাপাল্লে-বিশাখাপত্তনম্-বিজয়ওয়াডা (২৯/৯)। বিজয়ওয়াডা-নেল্লোর-নায়ুডুপেটা-চিত্তুর-কোলার-ব্যাঙ্গালোর (৩০/৯)। ব্যাঙ্গালোর-মাইসোর-বেগুর-গুন্ডুলপেট-বান্দিপুর (১/১০) (২/১০) (৩/১০)। বান্দিপুর-গুন্ডুলপেট-হেগডাডেভানকোট্-নাগারহোলে (৪/১০)। নাগারহোলে-মাইসোর-রঙ্গনাথিত্তু-ব্যাঙ্গালোর (৫/১০)(৬/১০)। ব্যাঙ্গালোর-হোস্কোট-নেল্লোর-বিজয়ওয়াডা (৭/১০)। বিজয়ওয়াডা-বিশাখাপত্তনম-চিলিকা (৮/৯০)। চিলিকা-কটক-বারিপদা-বেহরাগোড়া-কলকাতা (৯/১০)।

যারা এইভাবে বেড়াতে চায়, তাদের জন্য কিছু টিপ্স।

(১) সবসময় এক সেট স্প্যানার বা স্ক্রু-ড্রাইভার সঙ্গে রাখতে হবে। যদি পুরো টুল্স্-সেট থাকে তো কথাই নেই।

(২) গাড়ির কিছু দরকারি যন্ত্রপাতি সঙ্গে রাখতে হবে। সম্ভব হলে, বাড়তি একটা স্টেপ্নি (অর্থাৎ, দুটো স্পেয়ার হুইল)।

(৩) বেশ বড় একটা খাবারজলের পাত্র (জেরিক্যান হতে পারে)।

(৪) ফাস্ট এড কিট : ব্যান্ড-এড, ব্যান্ডেজ, তুলো, মলম, অ্যান্টিসেপটিক পাউডার, অ্যান্টাসিড, প্যারাসিটেমল, অ্যান্টিস্যামিনিক ট্যাবলেট ও সিরাপ, অ্যান্টিভমিট, অ্যান্টিডায়রিয়া, কাট অ্যান্ড পেন স্প্রে, মশা বিতারক সুগন্ধী।

(৫) ক্যামেরা। ফিল্ম। ব্যাটারি। স্ট্যান্ড। ফ্লাশগান। গাইড ম্যাপ। সাদা কাপড়। ব্রাশ।

(৬) খুব দরকারি : একটা ছাতা। একটা স্টিক প্লাশিট। একটা বড় টর্চ। কাগজ-কলম। মোমবাতি। দেশলাই। চামচ, প্লেট, গেলাস, ছুরি। নুন, গোলমরিচ, চা, চিনি। ফ্লাস্ক। শতরঞ্চি। ক্রেডিট কার্ড। ড্রাইভিং লাইসেন্স। আইডেন্টিটি কার্ড। গাড়ির পেপার্স (আপ টু ডেট)। এ টি এম কার্ড। সামান্য নগদ টাকার সঙ্গে ট্রাভেলার্স চেক।

(৭) জামাকাপড় : যে-ধরনের জায়গা, সে-ধরনের। যে-ক'দিনের জন্য যাওয়া, সেই পরিমাণ। সঙ্গে তোয়ালে, গামছা। টুপি। সানগ্লাস।

(৮) অন্যান্য : যাদের ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়ার ইচ্ছে, তারা আইস-বক্স নিয়ে গেলে ভালো। গান শুনতে চাইলে, কার অডিও সিস্টেম এবং বাছাই-করা ক্যাসেট আর সি-ডি। খেলাধুলোর শখ থাকলে, ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট ও কর্ক কিম্বা ফুটবল অথবা ক্রিকেটের ব্যাট-বল সঙ্গে থাকতে পারে। শীতকাল হলে, গাড়িতে ফগলাইট থাকা জরুরি। যাদের মোবাইল ফোন আছে, সেটাকে রোমিং করিয়ে নেওয়া। যেখানে গিয়ে থাকার ইচ্ছে, সেখানে আগে থেকে বুকিং করিয়ে যাওয়া উচিত।

শেষ পরামর্শ : গাড়ি নিয়ে কখনওই তাড়াহুড়ো নয়। ফাস্ট ড্রাইভিং এবং রাশ ড্রাইভিং-এর তফাৎ বুঝতে হবে। আস্তে চালিয়েও ভালো অ্যাভারেজ স্পিড পাওয়া যায়। বেড়াতে গিয়ে রেসিং নয়। লগ-বুক মেনটেন করলে আরও মজা। আর হ্যাঁ, যাওয়ার আগে তো বটেই, ফিরে এসেও গাড়ি সার্ভিসিং।

অলঙ্করণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। আলোকচিত্র : সব্যসাচী চক্রবর্তী

ছবির মজা

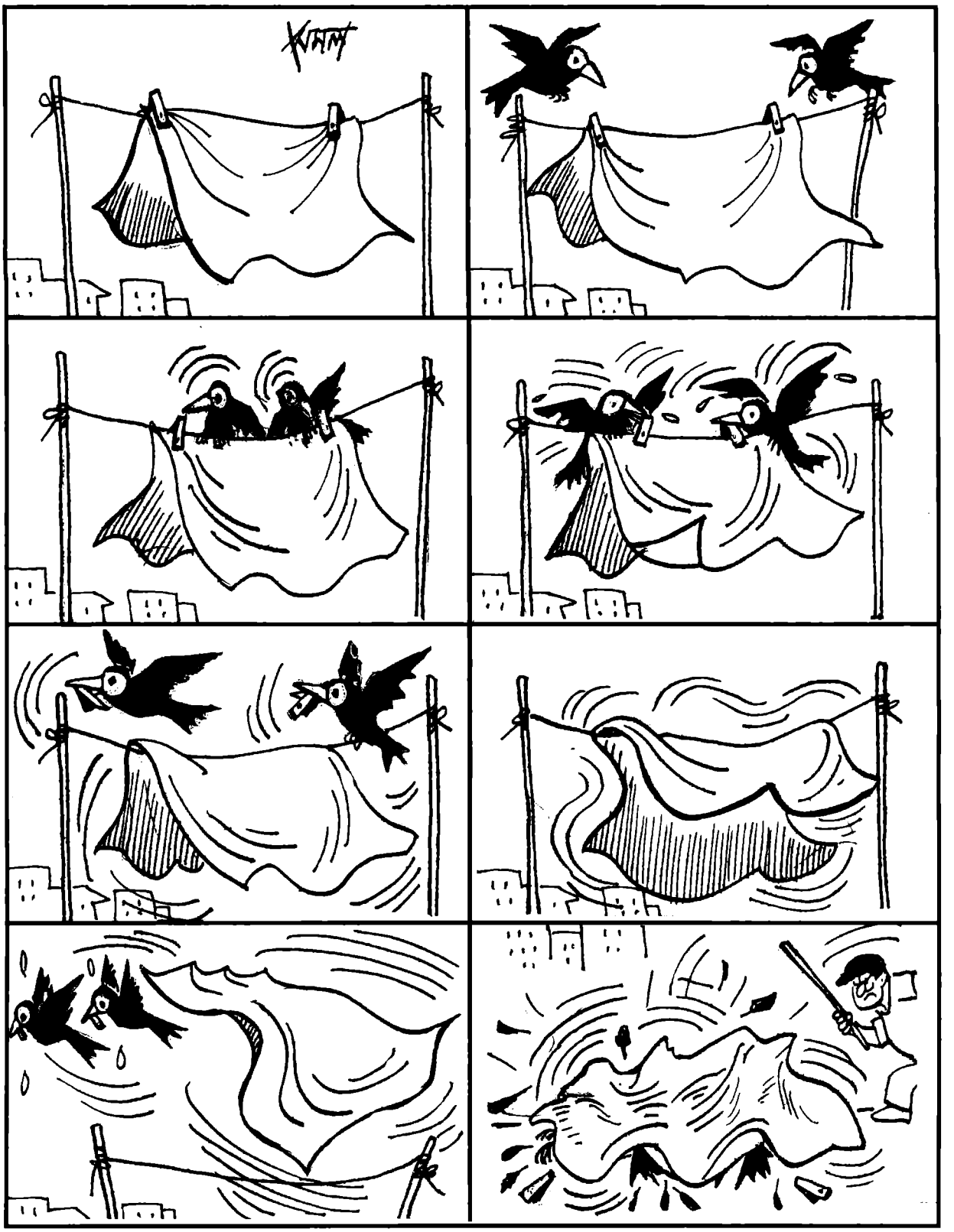

সকাল। আটটা কী সাড়ে আটটা। দোতলার বারান্দায় মাসিমা অপরাজিতা গাছের পরিচর্যা করছেন। রোজ যেমন করেন। টোপা টোপা ফুলে গাছ ভরে গেছে। ঘন নীল রঙ। পুবের রোদ। মাসিমার ফর্সা টকটকে মুখে নীলের আভা। সেই গানটাই গুনগুন করছেন, 'ফুল বলে ধন্য আমি...'

মেজমামা বলিষ্ঠ একটা ক্যাঙ্গারুর মতো এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে আসছেন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন দর্শন পড়াতে। এই ব্যায়ামটা শিখে এসেছেন।

মাসিমা বলছেন, 'এইবার থামলে হয় না ? ক্যাঙ্গারুরাও মাঝে মাঝে রেস্ট নেয়।'

কোনও ফল হল না।

আমি দাঁড়িয়ে আছি ঠিক নীচের উঠোনে। বেশ বড় বাঁধানো উঠোন। দাঁড়িয়ে থাকার কারণ, মোবাইলে বড়মামার সংক্ষিপ্ত আদেশ : 'মাল যাচ্ছে। ডেলিভারি নিবি।'

'তুমি কোথায় আছ ? কী মাল ?' কটাস্। লাইন কেটে দিল। সাত-সকালে কোথা থেকে কী মাল আসবে ?

নীচের উঠোনে একটা রবারের বল থাকে। আমি আর বড়মামা মাঝে মাঝে খেলি। পাশেই মাসিমার বিশাল রান্নাঘর। বড়মামার এলোপাথাড়ি শটে অনেক কিছু চুরমার হয়েছে। মাসিমা প্রতিবাদ করায় বড়মামা স্লোগানের মতো করে বলেছেন, 'ভাঙছি। ভাঙব।'

মাসিমা বলেছিলেন, 'এমন বদ্‌ছেলেকে হস্টেলে দেওয়া উচিত।'

এত বড় একজন নামকরা ডাক্তার, কিন্তু শিশুর মতো সরল। আমি সেই কারণে বেস্ট ফ্রেন্ড।

আমাকে নিয়ে একদিন ঘোষালদের বাগানের পাঁচিল টপকে আম চুরি করতে গিয়েছিলেন। ধরা পড়ে গেলুম।

ঘোষালমশাই অবাক, 'ডাক্তারবাবু, আপনি ? আমার মরা ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন। ক' ঝুড়ি আম খাবেন ? বোম্বাই, ল্যাংড়া, হিমসাগর ? এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বড়মামা বললেন, 'সে হবে না। চুরি করে খাওয়ার আলাদা আনন্দ।'

ঘোষালমশাই মহানন্দে বললেন, 'বেশ বেশ। কুকুর তিনটেকে বেঁধে দিচ্ছি। যত পারেন চুরি করুন।'

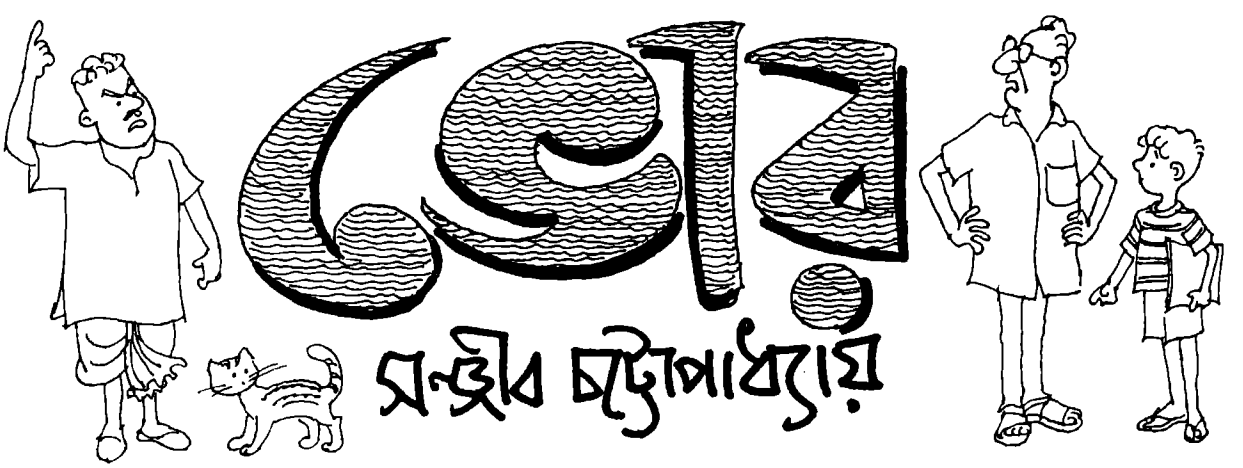

বড়মামা গম্ভীর মুখে বললেন, 'চোরকে চুরি করতে বললে, সেটা আর চুরি থাকে না। সেটা তখন হয়ে যায় নেওয়া।'

সদরে একটা টেম্পো দাঁড়াল। প্রথমেই ঢুকল একটা খাট। যে-খাটে চাপিয়ে শ্মশানে ডেডবডি নিয়ে যাওয়া হয়। এলো একটা তোশক, সাদা চাদর দিয়ে রোল করা। অনেকটা নারকোল দড়ি, মোটা লম্বা দুটো বাঁশ। মোটা দু' প্যাকেট ধূপ। একটা মাটির কলসি। উঠোনের মাঝখানে সব জড়ো হল।

দু'জনের একজন বললেন, 'মাল মিলিয়ে নিয়ে চালান সই করে দাও। সন্ধ্যের মুখে ফুল, মালা, ধামা-ভর্তি খই আর খুচরো পয়সা এসে যাবে।'

ওপরের বারান্দায় দুটো মুখ ঝুঁকে আছে। মেজমামার মুখ থেকে কথা বেরল, 'বাড়ি ভুল হয়েছে। এ-বাড়িতে কেউ মারা যায়নি।'

'যাবে। রাত বারোটার সময় বড়বাবু অক্কা পাবেন।'

'কোন জ্যোতিষে বলেছে?'

'যিনি যাবেন তিনিই বলেছেন।'

বিকট শব্দে টেম্পো চলে গেল। মাল পড়ে রইল উঠোনে।

কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং বড়মামা এলেন। মাসিমা রান্নাঘরে। ভীষণ গম্ভীর। চিত্রা শিলে মশলা বাটছে। ধনে-জিরের গন্ধ। হরিদা রোজকার মতো খিড়কির পুকুর থেকে একটা রুইমাছ তুলে দিয়ে গেছে। কলতলায় চোখ উলটে চিৎপাত। মাসিমার শিক্ষাপ্রাপ্ত তুলতুলে, থাপুর-থুপুর আদুরে বেড়াল সুন্দরী অদূরে আধবোজা চোখে পাহারা দিচ্ছে। কার্নিসে দুটো সংযত কাক ঘাড় কাৎ করে কেবল দেখছে। ডাকছে না।

বড়মামা ঢুকেই বললেন, 'বাঃ! সব রেডি। তুই টেপটা নিয়ে আয়।'

উঠোনের ওই মাথায় বেদিতে বসে মেজমামা অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা ক্যাঙ্গারু-কাপে নিউজিল্যান্ডের কফি পান করছিলেন। পরপর তিনদিন বাক্যালাপ বন্ধ।

সামান্য কারণে। অস্ট্রেলিয়া ভালো না ইংল্যান্ড ভালো। বড়মামা বলেছিলেন, 'ইংল্যান্ড ইজ ইংল্যান্ড। খাঁটি সায়েবরা ইংল্যান্ডে থাকে। অস্ট্রেলিয়ায় সব ট্যাঁশ্ গরু।' এই অবদি প্রবলেম ছিল না। হঠাৎ সুকুমার রায় আবৃত্তি করায় কেস জন্ডিস হয়ে গেল।

'ট্যাঁশ্ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে;
যার খুশি দেখে এস হারুদের আফিসে।
চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু, মুখখানা মস্ত,
ফিটফাট কালো চুলে টেরিকাটা চোস্ত।'

এই শেষ দুটো লাইনে মেজমামা নিজেকে খুঁজে পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'তুমি একটা ট্যাঁশ্ গাধা।'

যথারীতি মাসিমা খুন্তি হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাক্যযুদ্ধ বন্ধ করলেও, কথা বন্ধ হয়ে গেল।

বড়মামা মেজমামাকে লক্ষ্যই করেননি। টেপটা পেয়ে পকেট থেকে একটা ক্যাসেট বের করে চালিয়ে দিলেন।

খোল-করতাল সহযোগে গম্ভীর গম্ভীর সমবেত গলা: 'বলো হরি, হরিবোল। বলো হরি, হরিবোল।'

মাসিমা বিশেষ একটা কিছু রাঁধছিলেন, রবিবারের স্পেস্যাল। সেটাকে সামলে বেরিয়ে এসে কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, 'জানতে পারি, ব্যাপারটা কী?'

বড়মামা বললেন, 'নিশ্চয়! তোকে না-জানিয়ে কবে আমি কোন কাজ করেছি! তার আগে বাঙালি-কাপে এক কাপ দার্জিলিং চা খাওয়াবি কুসী। নো নিউজিল্যান্ড, নো অস্ট্রেলিয়া।'

বড়মামা এতক্ষণে বেদির দিকে তাকালেন। মেজমামা বসে আছেন।

খুঁচিয়ে ঘা করার কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু বড়মামার স্বভাব। বললেন, 'বাবা! গণপতি! কপি খাচ্ছেন, কপি।' তারপর বিকট সুরে,

'গণেশদাদার পেটটি নাদা,
গায়ে মেখেছেন সিঁদূর,
কলাগাছকে বিয়ে করেছেন,
বাহন তাঁহার ইঁদুর।'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়।'

মাসিমা এসে পড়ায় ব্যাপারটা বেশি দূর এগোল না।

বড়মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'মানুষ যখন মরে যায়, তখন সে একেবারেই মরে যায়।'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কী আবিষ্কার! নোবেল পুরস্কার পেলেই হয়!'

বড়মামা বললেন, 'দেখছিস কুসী!'

মাসিমা বললেন, 'অ্যায়! চুপ!'

বড়মামা চলছেন, 'তাকে যখন খাটে চাপিয়ে হরি-হরি বলে নিয়ে যায়, জীবনের এত বড় একটা ইভেন্ট, এত বড় একটা সেনসেশানের সে কিছুই জানতে পারে না। তার ফিলিংসের আমরাও কিছু জানতে পারি না, তাই...'

'তাই কী ?'

'আজ রাত বারোটায় আমি জ্যান্ত-মড়া হব। আমার চার সাকরেদ আমাকে কাঁধে করে, ধূপ জ্বালিয়ে, খই-পয়সা ছড়াতে ছড়াতে শ্মশান পর্যন্ত যাবে। শবাচ্ছাদনের তলায় এই ক্যাসেটটা বাজতে থাকবে। আবার আমি ফিরে আসব।'

মেজমামা বললেন, 'পাগল ভালো করো মা।'

মাসিমা বললেন, 'উঃ! মা মরে গিয়ে কী বাঁশ যে দিয়ে গেছে আমাকে!'

মেজমামা হঠাৎ খুব উৎসাহ পেয়ে গেলেন, 'আইডিয়া! আমি আগে আগে খই ছড়াতে ছড়াতে যাব। সাতদিন অশৌচ পালন করব। তারপর ঘাটকামানো, ঘটা করে শ্রাদ্ধ হবে। 'ওঁ গঙ্গা' চিঠি। নিয়ম ভঙ্গ। এর পর বড়কে যে দেখবে, ভূত ভেবে দৌড়ে পালাবে। তখন গয়ায় পিণ্ডি দিতে যাব। ডিসপেনসারি বন্ধ, প্র্যাকটিস বন্ধ। আর, আর সব সম্পতির মালিক আমি। তুমি যখন রাত বারোটায় মরবে, তখন অ্যায়সা চিৎকার করে কাঁদব—পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে যাবে। তোমার সব কিছু আমার, আমার। মৃত্যুর পরে, আরও পরে, আরও পরে কী হয়, সেটাও তো জানা দরকার। তাছাড়া চুল্লির উত্তাপ—সেটাও জানা দরকার। সঙ্গে যখন আছি, ঢুকিয়েও দিতে পারি।'

বড়মামা চিৎকার করে উঠলেন, 'মার্ডার! মার্ডার!'

সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়িতে কান্নার রোল। ছুটতে ছুটতে অলকা এলো। চুল উড়ছে। পায়ে চটি নেই, 'কাকাবাবু, মা...' এইটুকু বলতে পারল।

বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'কুইক। কুইক।'

বড়মামা ছুটছেন। ডাক্তারি ব্যাগ হাতে আমি পেছনে। রান্নাঘরের বাইরে, চাতালে অলকার মা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। আমাদের এই দক্ষিণ পাড়ার সকলের প্রিয় দিদি। স্কুলের শিক্ষিকা।

বড়মামা ইঞ্জেকশান দিলেন। ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা করলেন। হল না। প্রাণ আর ফিরে এলো না। মাসিমা, মেজমামা—কেউই-আর একটু আগের লোক নয়। মা আর মেয়ের ছোট্ট সংসার। মা চলে গেলেন। তরতাজা, সুন্দর এক মহিলা। গভীর ঘুম।

অলকার মাথা বুকে চেপে ধরে মাসিমা বারে বারে বলছেন, 'আমি আছি। আমরা আছি।'

বড়মামার খাট, ফুলে ফুলে ঢাকা দেহ। এক আকাশ তারা, একটু চাঁদ। বারান্দায় মাসিমার পাশে অলকা। পাথরের মূর্তি। আমরা শ্মশানের দিকে এগোচ্ছি। গঙ্গার বাতাস গায়ে লাগছে।

শেষ রাতে গঙ্গার কিনারায় দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, 'কিস অব্ ডেথ। মৃত্যুর শীতল ঠোঁট আমি স্পর্শ করেছি।'

মেজমামার চোখে জল। বললেন, 'বাজে জিনিস। মৃত্যু একেবারে থার্ড ক্লাস। প্রতিজ্ঞা কর, আমার আগে তুই মরবি না।'

ভোরের বাতাসে কত প্রাণ! আকাশে কত আলো!

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : দেবাশিস দেব

শৈলেন ঘোষ

ঝুংরিটুং

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ : সমীর সরকার

সবাই আমায় 'টুসু-টুসু' বলে ডাকে। আসলে আমার ভালো নাম টুনসু। আর আমার ছোট বোনটার নাম মানটি। ওর অবশ্য কোনও ডাকনাম নেই। সবাই মানটি বলেই ডাকে। আর ক'দিন পরে আমি বারোয় পড়ব। কিন্তু মানটির আটে পড়তে এখনও ক' মাস দেরি আছে। এবারও আমার জন্মদিন হবে। ক'মাস পরে মানটির।

আমাদের এই-যে দেশটা দেখছ, আদতে এটা একটা দ্বীপ। তিনদিকে জল থইথই সমুদ্র। একদিকে পাহাড়। পাহাড়ের ওই মাথায় সাহেবদের গির্জা। পাহাড়ে যত পাথর, পাহাড়ের গায়ে তত গাছ। বন হয়ে আছে। এই বনের ফাঁক দিয়ে ওই ওপরের গির্জাটা ছবির মতো দেখতে লাগে। ভিনদেশি অনেক মানুষ এই দ্বীপে হাওয়া বদল করতে আসেন। নানান দেশের কত অজানা মানুষের দেখা পাই। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলেন, অনেকের সেই মুখের কথার একচুলও আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু তাঁদের পোশাক-আশাক দেখতে হয় অবাক-চোখে। ভারী ভালো লাগে।

আমাদের এখানে একটা মন্দিরও আছে। সমুদ্র-দেবতার মন্দির। মন্দিরটা গির্জার মতো অত ওপরে নয়। গির্জার মতো হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে উঠতেও হয় না পাথর টপকে। অনেকটা নীচে। আমার বাবাকে প্রায়ই সমুদ্রে যেতে হয়। যেতে হয় নৌকোয়। মাছ ধরতে। আমাদের একটা নৌকোও আছে। ওই নৌকো ভর্তি করে মাছ ধরে আনেন বাবা। বেচে আসেন ব্যাপারীর কাছে। বাবা যখন সমুদ্রে যান, সমুদ্র-দেবতাকে প্রণাম করে যান। যখন ফিরে আসেন, একটি মাছ সমুদ্র-দেবতাকে আগে দিয়ে, তবেই বেচাকেনা করতে হাটে যান।

এই দেখেছ, আসল কথাটাই তো বলা হয়নি! বলতে ভুলে গেছি আমাদের দ্বীপের নামটাই। শুনলে, তোমাদের কেমন লাগবে জানি না। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে। ঝুংরিটুং। তুমি যদি পাখি হতে, শূন্য আকাশ থেকে যদি ঝুংরিটুংকে দেখতে, তোমার মনে হতই-হত দ্বীপটা বুঝি এইটুকু! মনে হত, সমুদ্রের অতল

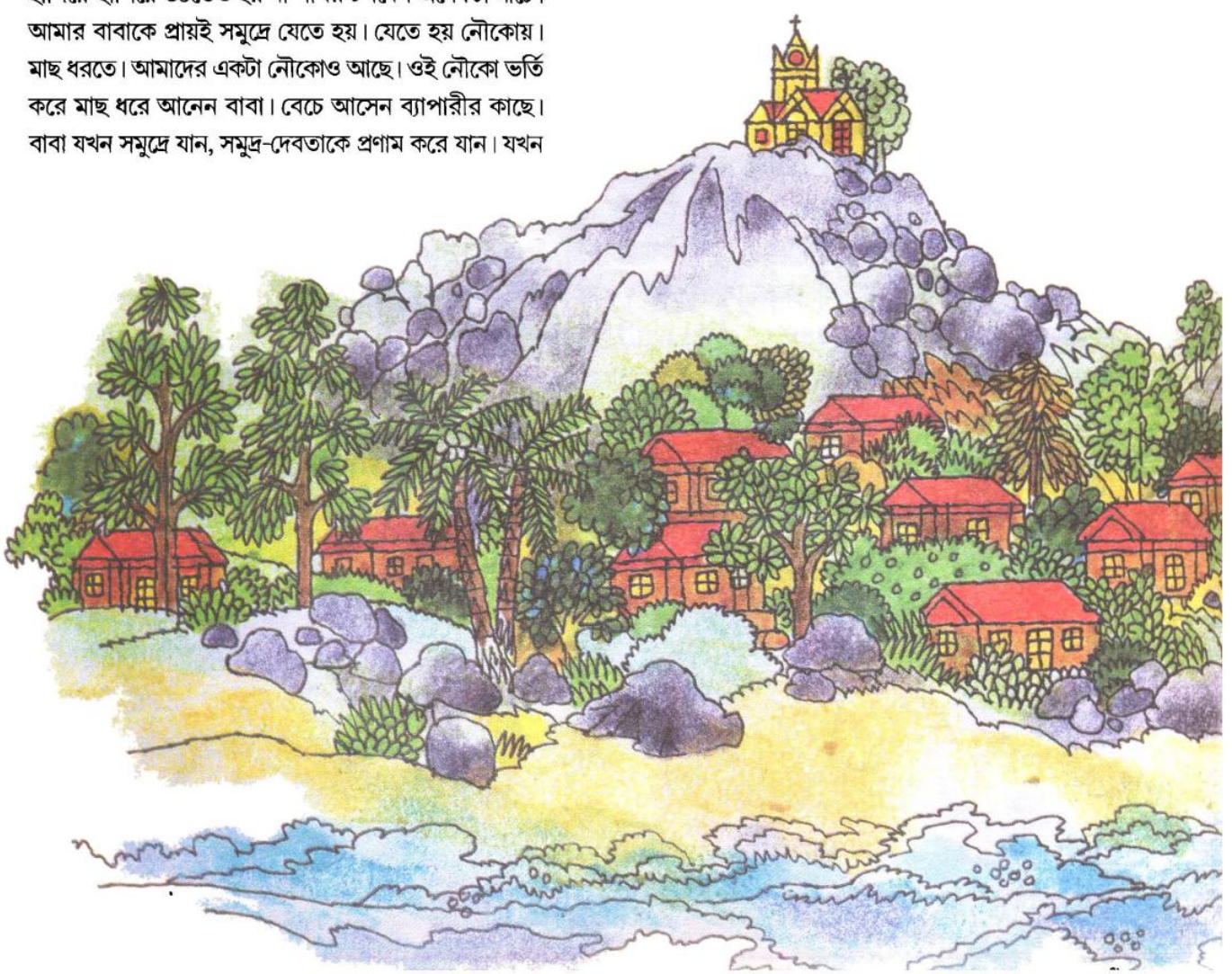

জলের গভীর থেকে একটুখানি মাথা তুলে একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। বুঝি আলতো-ছোঁয়ায় আকাশের কোলে মাথা ঠেকাতে চায় পাহাড়টা।

না, মোটেও তা নয়! মোটেও ঝুংরিটুং এইটুকু নয়! অনেক বড়। যারা অনেক ওপর থেকে অনেক নীচে তাকায়, তাদের চোখে তখন সব কিছুই ছোট মনে হয়। তবে, এটা মিথ্যে নয়, একদিন সমুদ্রের নিচ থেকেই মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল ঝুংরিটুং। বুঝিবা ঝুংরিটুং কোনও পাহাড়েরই চুড়ো। নইলে ঝুংরিটুং-এর সারা গা কেন অমন আঁকাবাঁকা, এলোমেলো, ঢেউ-খেলানো, এবড়ো-খেবড়ো!

হোক ঝুংরিটুং আঁকাবাঁকা, ঢেউ-খেলানো, কিন্তু কী সুন্দর দেখতে তাকে! জল থইথই সমুদ্রের দামাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে তটের ওপর, একটার পর একটা। চারদিকে আকছার ঝাউ আর পামগাছ। নারকেল আর রবার গাছও চোখে পড়বে অজস্র। শুধু সবুজ আর সবুজ। গাছের গায়ে গাছ জড়িয়ে, ছায়া ছড়িয়ে যেন আলোর সঙ্গে খেলা করছে! আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে ছোট্ট ছোট্ট বাড়িঘর। কাঠের তৈরি। ঝুংরিটুং-এর গায়ে সেইসব বাড়িঘর দেখলে তোমার ঠিক মনে হবে—কে যেন এখানে-ওখানে ছবি এঁকে রেখেছে। নানান রঙে। আর সেই নানান রঙের বাড়িঘর যেন সবুজ পাতার আড়াল থেকে টুকি দিয়ে ডাকছে তোমায়, টুকি-ই-ই-ই! অবশ্য সে-টুকি শোনা যায় না। সমুদ্রের যা গর্জন!

এই উঁচু-নিচু দ্বীপের যে ছোট্ট বাড়িটায় আমরা থাকি, সেটা কিন্তু কাঠের নয়। মাটি আর পাথর দিয়ে তৈরি। বাড়িতে আমরা এখন থাকি চারজনে। মা, বাবা, মানটি আর আমি। আগে দাদুনও ছিল। দাদুন মানে, আমাদের দাদু। এখন আর দাদুন নেই।

রোজ সকালে যখন গির্জার ঘণ্টা বাজে, সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে সে-ঘণ্টার শব্দ যখন একাকার হয়ে ঝুংরিটুং-এর আনাচে কানাচে ভেসে যায়, তখনই মানুষের ঘুম ভাঙার পালা। আকাশটা প্রথম-রোদে ঝলমলিয়ে উঠলেই, যে-সব মানুষ বেড়াতে আসেন দ্বীপে, তাঁদের কোলাহল শুরু হয়ে যায়। ফুটফুটে ছোট্ট কচি বাচ্চারা হুল্লোড় করতে করতে এমন হাসবে, দেখলে, তোমারও তাদের সঙ্গে হাসতে ইচ্ছে করবে। তখন সারা দ্বীপটাই হাসিতে, আনন্দে আর গানে উছলে ওঠে।

বাবা মাছ ধরতে যান দল বেঁধে। নৌকোয় শক্তপোক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, হাল ধরে, সমুদ্রের ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে। কোথায় যে হারিয়ে যান পলকে, আর দেখা যায় না। তখন তাঁরা মাঝ-সমুদ্রে। কবে তাঁরা ফিরবেন, তার কোনও ঠিক নেই। তিনদিনও হতে পারে, আবার সাতদিনও। আবার এমনও হওয়া খুব আশ্চর্য নয়—যদি আচমকা ঝড় ওঠে—তখন ভয়ংকর বিপদ! নৌকো যদি ডোবে, কেউ রক্ষা করার নেই। আবার নৌকো যদি পাক খেতে খেতে দিক হারায়, তবে তাঁরা কবে ফিরবেন, তার কেউ আভাস দিতে পারে না।

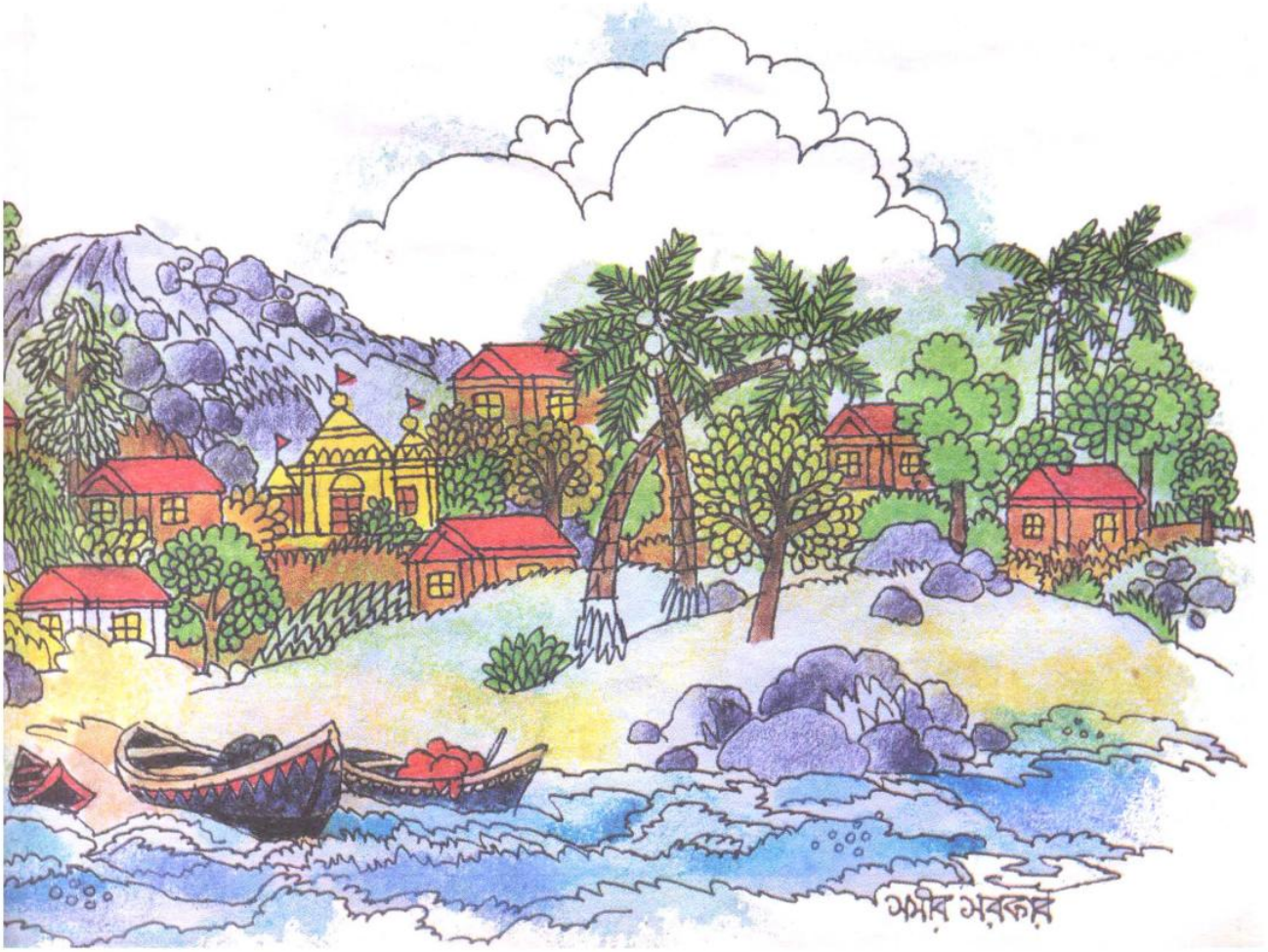

সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর !

এখন মাত্র ২ মিনিটেই !

৩টি রুটির খাদ্যগুণ*।

এসে গেল সম্পূর্ণ নতুন ম্যাগী ভেজিটেবল আটা নুডলস - যা সম্পূর্ণ গমের আটা আর আসল শাক-সব্জীর খাদ্যগুণে ভরপুর।

সম্পূর্ণ গমের আটার খাদ্যগুণ

সম্পূর্ণ গমের আটাতে রয়েছে আহার্য ফাইবার যা হজম প্রণালীর উন্নতি করে এবং ক্ষিধেকে সন্তোষজনক ভাবে মেটায়।

পুষ্টি বিশেষজ্ঞগণ সুপারিশ করেন যে, আহার্য ফাইবারের চাহিদা পূরণ করার জন্য বাচ্চাদের শাক-সব্জী এবং সম্পূর্ণ গমের দানা জাতীয় খাদ্য খাওয়া উচিত।

এখন প্রতিটি **ম্যাগী ভেজিটেবল আটা নুডলস**-এর প্যাকে রয়েছে ৩টি রুটির* সমান খাদ্যগুণ (এনার্জি, কার্বোহাইড্রেটস্, আহার্য ফাইবার, প্রোটিন ও ক্যালশিয়াম-এর দিক থেকে)।

আসল শাক-সব্জীর খাদ্যগুণ

আপনার প্রিয় **ম্যাগী নুডলস**-এ যোগ করা হয়েছে মটরশুঁটি, গাজর, পেঁয়াজ আর ধনেপাতা। এখন আপনার পরিবার উপভোগ করতে পারবে অসাধারণ স্বাদ এবং ভাল স্বাস্থ্যের আনন্দকে — মাত্র ২ মিনিটে।

ম্যাগী ভেজিটেবল আটা নুডলস সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর!

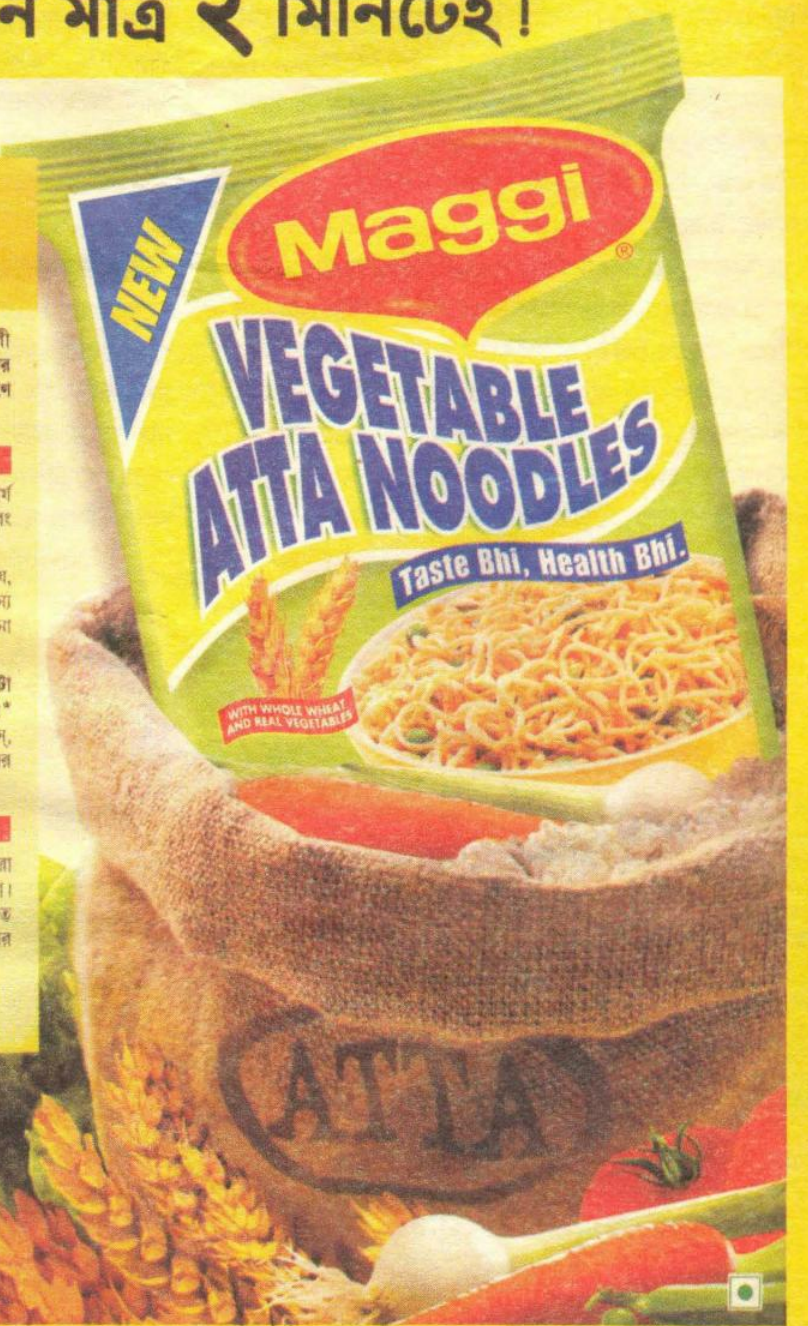

Maggi

সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর

হ্যাঁ, ঝড়ের তোড় কথাটা শুনলেই, আমার বুক কেঁপে ওঠে। মনে পড়ে যায় দাদুনের মুখখানা। দাদুনকে আমি যেমন ভালোবাসতুম, তেমনই ভালোবাসত বোন মানটিও। মানটি যখন আরও ছোট ছিল, তখন সে আমার মতো দাদুকে 'দাদুন' বলতে পারত না। বলত, 'তাতুন'। মানটি ইচ্ছে হলেই দাদুনের কোলের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ত। গলা জড়িয়ে ধরত। গলা জড়িয়ে ছোট্ট দু'টি হাত দিয়ে দুলত। আদর করে বলত, 'তাতুন, একটা গান ছোনাও।'

দাদুন তখন তাকে বুকে টেনে নিতেন। আদর করে চুমো দিতেন। হো-হো করে হেসে উঠতেন। তারপর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গেয়ে উঠতেন :

'ছোট্ট আমার মানটি তোমার
গানটি কোথায় খুঁজি,
ঢেউ ঝলমল সাগর-জলে
লুকিয়ে গানের পুঁজি।
ঝাউ-ঝিরঝির পাতায় পাতায়
বাতাস বাজায় সুর,
মানটিসোনা সেই সুরে তার
গান আছে ভরপুর।
গান আছে আর মানটি তোমার
মনের কোঠায় শুনি,
তোমার হাসির সুরেই সে-গান
উঠছে যে গুনগুনি।'

দাদুন গাইছেন, আমি শুনছি। শুনতে শুনতে আমিও গুনগুন করছি। তারপর গানের সব সুরটা গলায় বসে যেতেই, দাদুনের সঙ্গে আমিও গেয়ে উঠছি। আর তখন মানটি আনন্দে দুলছে। দুলতে দুলতে ঘরের এ-পার ও-পার করে নাচছে। নাচতে নাচতে সে-ও আধো-আধো স্বরে গুনগুন করে উঠছে। তার নরম ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে উছলে উঠছে গানের শব্দগুলো ভাঙা ভাঙা। কী মিষ্টি শুনতে লাগছে! অবিশ্যি সে তো অনেকদিন আগের কথা। এখন আমিও বড় হয়েছি, মানটিও। এখন আর মানটি আধো-আধো স্বরে গান গায় না। এখন সে দস্তুরমতো আমার গলায় গলা মিলিয়ে আমার সঙ্গে গাইতে পারে। ঠিক কথা, দাদুন কী ভালো গাইতে পারতেন। ঠিক কথা, দাদুনের গান শুনতে শুনতে আমরাও কত গান শিখে ফেলেছিলুম। আমি আর মানটি। কিন্তু এখন আর আমাদের শেখা হয় না। কে শেখাবে? যিনি শেখাবেন, তিনিই তো আজ বন্দি হয়ে আছেন বিদেশের কোনও কারাগারে! তা সে হয়ে গেল কতদিন! কতদিন নিঃঝুম হয়ে আছে বাড়িটা। খাঁ-খাঁ করছে দাদুনের ঘরখানা।

বলেছি তো, বাবা মাছ ধরতে সমুদ্রে যান। বলেছি তো, সমুদ্রের মাছ ধরে বাবা বেচাকেনা করেন। আসলে আমরা ধীবর। ধীবর কথাটার কী মানে, আগে আমি জানতুম না। দাদুই বলেছেন, 'যাঁরা মাছ ধরেন, তাঁদের বলে ধীবর।' দাদুনও মাছ ধরতেন। দাদুনই তো বাবাকে মাছ ধরতে শিখিয়েছেন। সমুদ্রে মাছ ধরা তো সহজ কাজ নয়। যেমন চাই সাহস, তেমনই হতে হয় ঝানু ওস্তাদ। জলের পোকা। আমার দাদুনও ছিলেন তেমনই ওস্তাদেরও ওস্তাদ। সমুদ্র দাদুনকে চেনে, দাদুনও চিনতেন সমুদ্রকে। তাই, যে-সমুদ্রের গর্জন শুনলে তোমাদের বুক কাঁপে, যে-সমুদ্রের উথাল-পাথাল ঢেউ দেখলে তোমাদের চোখের দৃষ্টি ভয়ে ঝাপসা হয়ে যায়, সেই সমুদ্রই আমাদের আপন। বন্ধু।

তবুও, মাঝে মাঝে, এই বন্ধুই যখন ঝড়ের আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাণ্ডব শুরু করে দেয়, তখন তাকে কে সামলাবে! সেদিন সামলাতে পারেননি আমার দাদুনও। দাদুনও সেদিন অনেক ভেবেচিন্তে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন, সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন আমার বাবাও। ভাবনার কারণ অবশ্য একটা ছিল। সেদিন আকাশে ছিল মেঘ। তবে সে-মেঘ দেখে দাদুনের একেবারেই মনে হয়নি—মেঘের ফাঁকে বিপদ লুকিয়ে আছে! দাদুন আকাশ চেনেন। সেই কোন কিশোর বয়স থেকে তাঁর সমুদ্রে আনাগোনা। আকাশ তাঁর চেনাজানা। কোন আকাশের মেঘে ঝড় লুকিয়ে আছে, আর কোন আকাশের মেঘে বৃষ্টি, তিনি দেখেই বলে দিতে পারতেন। কিন্তু সেদিন তিনি ঠকে গেছলেন। বুঝতে পারেননি, এ-মেঘ ভয়ানক! আঁচ করতে পারেননি—ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসবে আচমকা!

হ্যাঁ, সেদিন সমুদ্রের বুকে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছিল অতর্কিতে। গর্জে উঠেছিল মেঘ। তারপর চকিতে উঠেছিল ঝড়। সমুদ্রের বুকের ওপর ঝঞ্ঝাঝড়ের সে কী তুলকালাম কাণ্ড!

দাদুন চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'সামাল! সামাল!' নৌকোর হাল ধরে নাকানিচোবানি খেয়েছেন। কখনও নৌকো ঘুরপাক খেয়েছে তীব্র গতিতে। কখনও টালমাটাল করে দিক হারিয়েছে। কখনও উথলে উঠেছে ঝড়ের ধাক্কায় ঢেউ-এর ওপর। নৌকোর মানুষরা তখন প্রাণের আশায় নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই দামাল সমুদ্রের বুকে। তখনও সেই নৌকোয় ঢেউ-এর ঝাপটায় বাঁচার লড়াই করছেন আমার দাদুন আর বাবা।

কিন্তু না, আর পারলেন না তাঁরাও।

ঝড়ের তোড়ে ওলোট-পালট খেয়ে গেল নৌকো! ডুবে গেলেন দু'জন মানুষই। কোথায় যে ভেসে গেলেন তাঁরা, কে তার হদিশ করবে! দাদুন যেমন ফিরলেন না, তেমনই বাবাও। ফিরলেন না কোনও মানুষই। সেই দুর্বিপাকে সবাই হারিয়ে গেলেন।

সে-এক ভীষণ দুঃখের দিন। মা কেঁদেছেন আকুল হয়ে। মায়ের কোলে বসে মানটি কেঁদেছে দু' চোখে জল উছলে। আর আমি কেঁদেছি, মাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে। মানটিকে বুকে জড়িয়ে। তা সে হয়ে গেল কবেকার কথা।

আর এখন?

এখন আর কাঁদেন না মা। মানটিও। চোখে জল নেই আমারও। বাবা ফিরে এসেছেন। আর, আমরা জানতে পেরেছি, দাদুনকে উদ্ধার করেছে এক বিদেশি জাহাজের নাবিকেরা। দাদুন বন্দি আছেন সেই দেশেই।

কিন্তু বাবার ফিরে আসা, সে-এক ভয়ংকর রুদ্ধশ্বাস ঘটনা। এ কেমন করে হয়! যে-মানুষটা মাঝ-সমুদ্রে নৌকো উলটে ডুবে যান, তিনি প্রাণে বাঁচেন কেমন করে?

বাবার মুখে শোনা সেই আশ্চর্য ঘটনা তোমাদের না-শুনিয়ে পারছি না।

সমুদ্রের নীচে যেমন প্রবাল আছে—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, তেমনই আছে ভয়ংকর তিমি। আছে শুশুক। হাঙর। আরও কত মাছ-মছলি আর বিষাক্ত জলচর প্রাণী। ওই মাঝ-সমুদ্রে, তাদের কবল থেকে বেঁচে ফেরা এক অসাধ্য কাজ। হ্যাঁ, জলের ভেতর জলচর প্রাণীর সঙ্গে তো আর যুদ্ধ করা যায় না। কিন্তু বাবাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল একটা হাঙরের সঙ্গে। একেবারেই খালি হাতে। একজন মানুষ যখন ঝড়ের ধাক্কায় নৌকো উলটে হাবুডুবু খাচ্ছে জলের ভেতর, বাঁচার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, তখন কে ভাবে, যে, তার পেছনে শত্রু! তাকে তাক করেছে একটা হাঙর!

বাবার মাথার ওপরে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব, আর নীচে সমুদ্রের স্রোতে ভেসে আসছে হাঙর! কেমন করে বাবা যেন টের পেয়ে যান! বাবার পালাবার পথ নেই। কাজেই, হাঙর আক্রমণ করার আগেই, তিনিই জাপটে ধরলেন হাঙরটাকে। এই হাঙরটা ছিল সাদা রঙের। হবে চল্লিশ হাত লম্বা। এই সাদা হাঙরগুলো হয় মানুষ-খেকো। তেমনই ধারাল দাঁত এদের। বলতে কী, এদের সঙ্গে লড়াই করা মুখের কথা নয়। একবার দাঁত দিয়ে ঘাড়টা কামড়ে ধরলে, নির্ঘাৎ মরণ। এই সাংঘাতিক এক মানুষ-খেকো হাঙরের সঙ্গে একজন নেহাতই অসহায় মানুষ লড়াই করছেন সমুদ্রের মধ্যিখানে, এ কী বিশ্বাস করা যায়!

তবু বিশ্বাস করতেই হবে। বাবা তার পেটের নীচে। হাঙরের দাঁত-বার করা হাঁ-মুখখানা পেটের এই নিচ থেকে অনেকখানি দূরে। বাবা তার পেটটা ছেড়ে পড়িমড়ি করে পিঠের ওপর উঠে পড়লেন। জলের নীচ থেকে মুখ তুলে নিশ্বাস নিলেন। তারপর দমাদ্দম কিলোতে লাগলেন।

আকাশের ঝড় তখন অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু হাঙরের সঙ্গে তখন বাবার লড়াই চলছে একতরফা। কেননা, হাঙরটা শত চেষ্টা করেও কামড়াতে পারল না বাবার শরীরের একটু অংশও। কিন্তু বাবার ঘুসির রদ্দা খেয়ে তার পিঠের হাড় যে ভাঙতে শুরু করেছে, এটা বুঝতে বাবার অসুবিধে হয়নি। হাঙরটা যে পালাতে পারলেই বাঁচে এখন, সে তো বোঝাই যায়। তখন তার পিঠে রদ্দা মারার ক্ষমতাও আর বাবার নেই। অগত্যা তিনি নেমে পড়লেন হাঙরের পিঠ থেকে। ভেসে পড়লেন জলে। হাঙরটা যে হেরে ভূত হয়ে পালাচ্ছে, এটা পর্যন্ত তাঁর দেখার শক্তি হারিয়ে গেছে। আর দম নেই তাঁর। এবার হয়তো তিনি জ্ঞান হারাবেন।

একেই বলে ভাগ্য! কেননা, উথাল-পাথাল ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ যেন বাবার নজরে পড়ে গেল, দূরে, খানিক দূরে সবুজ গাছের সারি। সেই গাছের সারি চোখে পড়তেই বাবা জ্ঞান হারালেন। আসলে তখন তিনি অজানা কোনও সমুদ্র-সৈকতে পৌঁছে গেছলেন। সেই সৈকতেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইলেন তিনি।

(ক্রমশ)

অনিরুদ্ধ দেব

মনের কথা কই

'মন' কথাটার কতরকম মানে হয়! 'মন ভালো নেই।' এখানে মন কথাটা অনুভূতির কথা বলছে। 'মনে নেই' বলতে স্মৃতিশক্তি বা মেমরির কথা বলা হল। আবার 'মন দিয়ে পড়ো' বললে লোকে বুঝল মনঃসংযোগ করার কথা। অর্থাৎ, মনের অনেক কাজ। চিন্তা, ভাবনা, অনুভূতি, স্মৃতি, সিদ্ধান্ত নেওয়া, নতুন জিনিস শেখা... এই ফর্দ শেষ হবে না।

মনটা যে আমাদের মস্তিষ্কেই রয়েছে, সে-বিষয়ে আজ আর সন্দেহ নেই। কিন্তু মনের কোন কাজটা ব্রেন-এর কোন জায়গায় হয়, সে-সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা নেই। বিজ্ঞানীরা ম্যাপের মতন ব্রেন-এর ছবিতে এঁকে দেখিয়ে দিতে পারেন—ঠিক কোন জায়গাটা দিয়ে আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুল নাড়ানো হচ্ছে। অথবা ব্রেন-এর কোন গ্রন্থি দিয়ে থাইরয়েড গ্রন্থির কাজকর্ম পরিচালনা করা হচ্ছে। কিন্তু কোনও বিজ্ঞানী, কোনও ডাক্তার ছবি এঁকে কাউকে বোঝাতে পারবেন না—মস্তিষ্কের কোথা দিয়ে আমরা মন দিয়ে লেখাপড়া করি। কিম্বা কোথায় আমাদের স্মৃতিশক্তি লুকিয়ে আছে।

এবং এর ফলেই, আমরা প্রায়ই মনের কষ্টকে ভুল বুঝি। হাত-পা-মাথার কষ্টে যেমন শরীরের সেই জায়গাটাকে দেখা যায়, লিভার বা লাংস-এর কষ্টকে যেমন রক্ত পরীক্ষা করে বা এক্স-রে করে বোঝা যায়, মনের কষ্ট তো দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না। মনের কষ্ট বোঝার জন্য আগে তাই মনটাকে বোঝা দরকার। প্রায়ই শোনা যায়, 'মনখারাপ আবার কী ? মনটাকে শক্ত করে নে, তাহলেই ঠিক হবে!' কিন্তু পা ভেঙে গেলে কেউ বলে না, 'পা-টাকে শক্ত করে নে, তাহলেই হবে।'

শরীরের যেমন কষ্ট হয়, অসুখ হয়, ঠিক তেমনি মনেরও কষ্ট আর অসুখ দুই-ই হয়। শরীরের কষ্ট আর অসুখ যেমন আলাদা—কষ্ট হচ্ছে মানেই অসুখ নয়—মনের বেলাতেও একই কথা। সারাদিন রোদে ঘুরলে শরীর আনচান করে, কান দিয়ে আগুন বেরোয়। তেমনি কেউ খুব জোরে বকলে, 'তুই নিশ্চয়ই ফেল করবি' বললে, মন আনচান করে, কান ভোঁ-ভোঁ করে। কত জোরে আঘাত লাগল, তার ওপর ব্যথা আর কষ্ট নির্ভর করে, তাই না ? হোঁচট খেয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের নুনছাল উঠে গেলে যেমন ব্যথা, সেই বুড়ো আঙুলের ওপর দিয়ে যদি গাড়ি চলে যায়, তার ব্যথা অন্যরকম। ঠিক তেমনি মা-বাবা বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় যেতে না-দিলে যে মনোকষ্ট, প্রিয়তম বন্ধু চিরদিনের মতন মুম্বাই চলে গেলে অন্যরকম কষ্ট।

মনের সব কষ্ট আমরা চেষ্টা করলেও নিজেরা সমাধান করতে পারি না। তার প্রধান কারণ, আমরা তার পথটাই জানি না। অনেক সময় পথটা জানা থাকলেও, নিজের ওপর সেই পদ্ধতিগুলো কাজে লাগাতে পারি না। তখন অন্যের সাহায্য দরকার হয়। বন্ধুদের কাছে গেলে সুবিধা এই, যে, তারা আমার ভালো ভেবেই আমার সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু অসুবিধা এই যে, বন্ধুরা অনেক সময়ে কী বলতে হবে না-জেনে, ভুল কথাও বলতে পারে। সে-কথা আমার কাছে শুনতে খারাপ হতে পারে। সেই পরামর্শ আমার পক্ষে ঠিক না-ও হতে পারে। তবে ?

তাই মনের কষ্টের সমাধানের জন্য আর-এক রকমের বন্ধু আছে। যারা মনের কথা জানে, মনের ভাব বোঝে। তাদের কাছে আমার মনের কষ্ট, দুঃখ, এমনকী মনের অসুখও নিয়ে গেলে, তারা আমার কষ্ট বুঝবে। আর সেটা ঠিক কী করলে কমবে, সেটাও জানাবে। তারা আমার স্কুল বা পাড়ার বন্ধুর মতন নয়। তাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার বা একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার সম্পর্ক নয়। তবু তারা আমার বন্ধু। কারণ, তাদের কাছে আমি আমার মনের কথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি। আর তারা আমাকে তার সমাধান দিতে পারে।

তোমরা যদি চাও, চিঠি দিতে পারো। 'সন্দেশ'-এর নতুন ঠিকানায় : ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড। কলকাতা ৭০০০২০। তোমাদের মনের সমস্যা নিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দেবো। খামের ওপর লিখে দিও 'মনের কথা কই'। কিম্বা সটাং ই-মেল করতে পারো: sandesh1913@yahoo.co.in

নামাঙ্কন ও অলঙ্করণ: দেবাশিস দেব

টারগেট

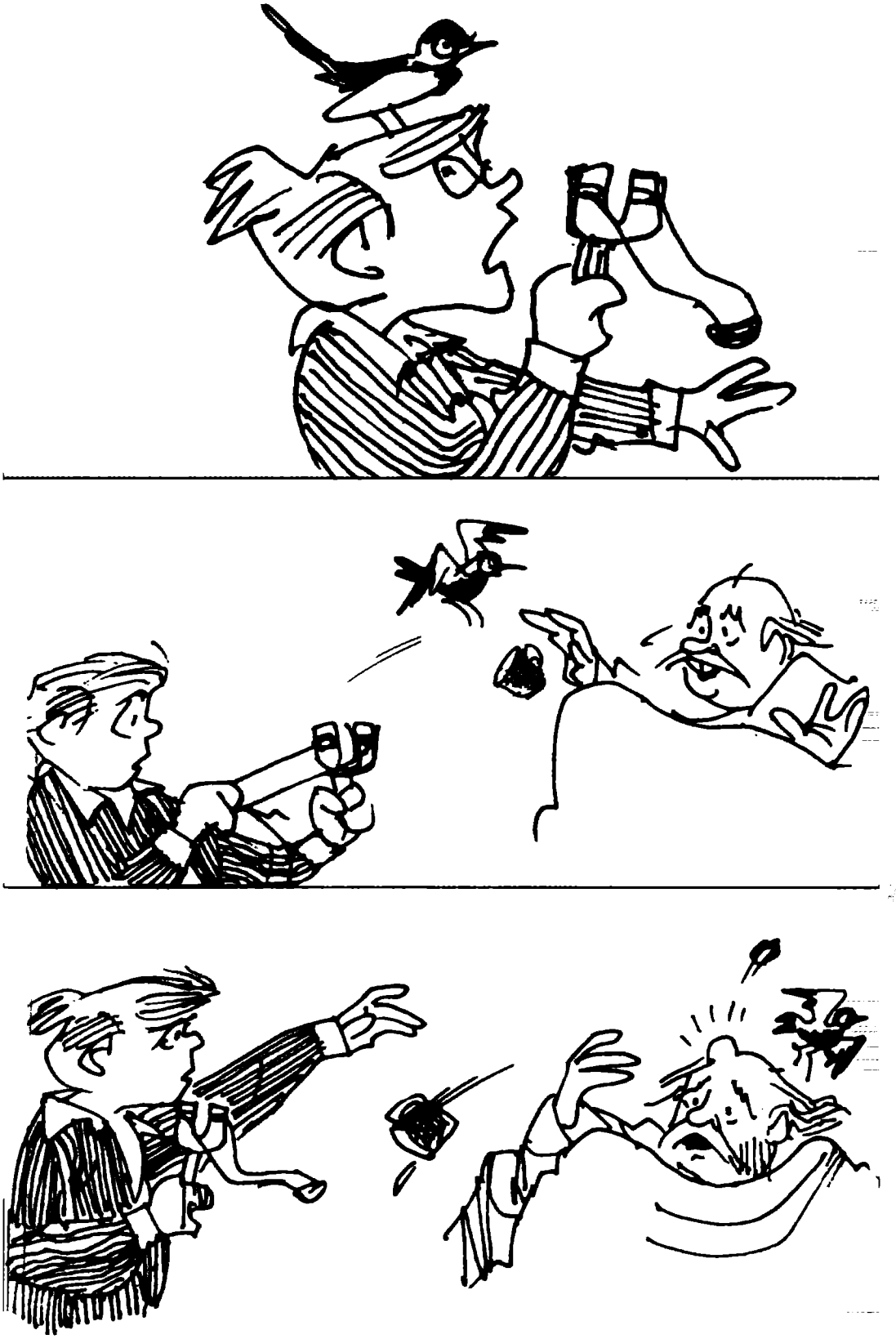

বৃশ্চিক ধারাবাহিক

স্তব্ধ হৃদয়

ইন্দ্রনীল ঘোষ

প্রথমেই আলখাল্লা ঢাকা ভয়ঙ্কর মূর্তি আক্রমণ করল বৃশ্চিককে!
হু-য়া-য়া-য়াঃ-!
ক্র্যা-র-র-র-র
আঁ-
ধপ!
বড্ড ধীরগতি!
বৃশ্চিকের এক অব্যর্থ আঘাতে ছিটকে পড়ে ছায়ামূর্তি। কিন্তু এদিকে—
ঘ্যাঁ-য়া-য়া-য়া-!
Mohanik Ghosh
পেছন থেকে আক্রমণে ঝাঁপায় সেই অদ্ভুতদর্শন ভয়ঙ্কর জীবটি।
কিন্তু বৃশ্চিক তার চেয়েও দ্রুতগতি।
আঘাত এড়িয়ে গিয়ে হাতে তুলে নেয় 'হুল-ছোরা'
—যা জীবকে অজ্ঞান ও অসাড় করে রাখে বেশ কিছুক্ষণ!

পাঁচতারা হোটেল বললেই কী মনে হয়? একটা বহুতল, ঝাঁ-চকচকে বাড়ি—যার মধ্যে বিলাসের যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে অতিথিদের জন্য। তাক্ লাগিয়ে দেওয়া সব আসবাব, চোখ-ধাঁধানো আলো এবং গণ্যমান্য কিছু মানুষের মুখ—যাঁদের জন্যই এত আয়োজন। জুতো পালিশ থেকে জিভে-জল-আনা খাবার—সবকিছুই এখানে চাইলেই পাওয়া যায়, অর্থের বিনিময়ে। ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মমাফিক সবকিছু চলে, যাতে অতিথিদের বিন্দুমাত্র অসুবিধের কারণ না-ঘটে, তাঁরা যেন আবার আসতে চান এই অতিথিশালাতেই।

এই বিশাল আয়োজন সম্ভব হয় কী করে? কারা বয়ে নিয়ে চলেন এই মস্ত কর্মকাণ্ডের ভার? এঁদের বেশিরভাগই হলেন হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করা তরুণ-তরুণী, যারা ঠিক এই কাজগুলো করার জন্যই তৈরি হয়েছেন। এবং এটাকেই বেছে নিয়েছেন পেশা হিসেবে। শুধু পাঁচতারা নয়, আরও বিভিন্ন শ্রেণীর হোটেল, রেস্তোরা এবং রিসর্টেও তাঁরা চাকরি পেয়ে থাকেন। সব জায়গাতেই তাঁদের দায়িত্ব হল অতিথিদের তুষ্ট করা।

চলো, দেখা যাক কত ধরনের কাজ করতে হয় এই পেশার লোকেদের। অতিথি আপ্যায়ন, তাঁদের খাবারদাবার তৈরি থেকে শুরু করে নাচ-গানের তদারকি, এমনকী তাঁদের যাওয়া-আসার ব্যবস্থা পর্যন্ত। দায়িত্ব ভাগ করা থাকে। যিনি বার-ম্যানেজার—তিনি শুধুই সেখানকার যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকেন। শেফ-এর মাথাব্যথা অতিথিদের রসনার তৃপ্তি নিয়ে। হাউসকিপিং-এর ভার যাঁদের ওপর, তাঁরা হোটেলের ঘর এবং অন্যান্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে চলেন। প্রয়োজন হলে নিজের হাতেই তুলে নিতে হয় এইসব কাজের ভার। বিশেষ করে যাঁরা সবে চাকরিতে ঢুকেছেন, তাঁরা হাতে-কলমেই সব শেখেন।

খুব কঠিন মনে হচ্ছে? অন্য যে-কোনও কাজের চেয়ে শক্ত নয় কিন্তু। যদি একটা ভালো হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স করতে পারো, তাহলে তো কথাই নেই, সবকিছুই শেখার সুযোগ থাকছে সেখানে। না-না, অসাধারণ মেধা অথবা খুব উঁচু নম্বরেরও প্রয়োজন নেই। যেমন ধরো, রায়চকে অবস্থিত ইন্‌স্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি। এঁরা জোর দিয়ে থাকেন হাতে-কলমে কাজ শেখানোর ওপর। শুধু তাই নয়, এঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথিবীর বিভিন্ন নামকরা হোটেলে পাঠিয়ে থাকেন ইন্টার্নশিপের জন্য—অবশ্য অতিরিক্ত এক লাখ টাকা দিতে হবে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন আই আই এম টি কর্তৃপক্ষ এই কোর্সটির জন্য। সারা পৃথিবীতেই এদের ডিগ্রি স্বীকৃত। আরও একটা ব্যাপারে আই আই এম টি কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। এঁরা ম্যানেজার শ্রেণির কর্মী তৈরি করতেই বেশি আগ্রহী। তবে হ্যাঁ, এখানে পড়ার খরচ যথেষ্ট। সাড়ে তিন বছরের জন্য প্রতি বছরে ৫.২৫ লাখ টাকা। বেশ কয়েকটা কোর্স রয়েছে আই আই এম টি-র, যেগুলো আরও কম সময়ের। নিজেদের প্রয়োজন মতো বেছে নেওয়া যেতে পারে।

তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে সুভাষ বোস ইন্‌স্টিটিউট অব্ হোটেল ম্যানেজমেন্টেও। লীলা কেম্পিন্সকি থেকে ওবেরয় গ্র্যান্ড—সব জায়গাতেই চাকরি পেয়ে থাকেন এখানকার ছাত্র ও ছাত্রীরা। এছাড়াও চাকরির সুযোগ রয়েছে এয়ারলাইন্স, কল-সেন্টার, রিটেল স্টোর, এমনকী ব্যাঙ্কেও। এখানকার ছাত্ররাও বিদেশে পাড়ি দিয়ে থাকেন।

'অনেক পেশাতেই এখন তেমন চাকরি নেই। তাই অনেকেই হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ছেন এবং সহজেই ভালো চাকরি পাচ্ছেন।' বলছেন আসিফ শাহ, যিনি এন আই পি স্কুল অব্ হোটেল ম্যানেজমেন্ট-এর ডিরেক্টর। 'এবং যে-হারে হোটেল, এয়ারলাইন্স-এর সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তা অত্যন্ত সুখের খবর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য।' বলছেন আসিফবাবু। নিজেও হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে, দীর্ঘদিন বিভিন্ন পাঁচতারা হোটেলে কাজ করে, এই কলেজ শুরু করেছিলেন কয়েক বছর আগে। কিন্তু তখনও যথেষ্ট সম্মানজনক ছিল না এই পেশা। মাইনেপত্রও ছিল খুব কম। অবস্থাটা পাল্টেছে, আসিফবাবুর মতে। এন আই পি-তে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। প্রায় সকলেই চাকরি পেয়ে থাকেন হোটেল অথবা এয়ারলাইন্সগুলোতে।

সল্ট লেকের ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব্ হোটেল ম্যানেজমেন্টে রয়েছে দুটো কোর্স। একটা তিন বছরের ডিপ্লোমা, অন্যটা বি এ ইন হস্‌পিটালিটি ম্যানেজমেন্ট। এটাও তিন বছরের। এডিনবরার কুইন মার্গারেট ইউনিভার্সিটি কলেজের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এঁরা। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সুযোগ থাকছে তৃতীয় বর্ষে ইংল্যান্ডে পড়তে যাওয়ার। কিন্তু সেটা নির্ভর করছে তাদের ইচ্ছের ওপর। এবং ইংল্যান্ডে পাড়ি জমাতে গেলে অবশ্যই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে। ডিপ্লোমা কোর্সটার জন্য খরচ ২.৮২ লাখ টাকা। বি এ কোর্সটার জন্য একই পরিমাণ, এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত ৫৬০ পাউন্ড। এখান থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা হোটেল, ব্যাঙ্ক, এয়ারলাইন্স এবং বিলাসবহুল যাত্রী-জাহাজগুলোতে কাজের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

তবে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো হল তারাতলার ইন্‌স্টিটিউট অব্ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, কেটারিং টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড টেকনোলজি। সরকার পরিচালিত, তাই খরচও অনেক কম। শুধু এখানেই পড়ানো হয় ডিগ্রি কোর্স। স্বল্পমেয়াদি কোর্সও রয়েছে। সবগুলোই ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইন্‌স্টিটিউট্ এবং ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি দ্বারা স্বীকৃত। ডিগ্রি কোর্সের খরচ ৫০ হাজার টাকা। তিনটে স্বল্পমেয়াদি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য লাগবে ৭ থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে।

হোটেল ম্যানেজমেন্ট

জয় মিত্র

সাধারণত সব কলেজেই ভর্তির পরীক্ষা আছে। উচ্চমাধ্যমিকের নম্বরও দেখা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু বেসরকারি কলেজের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সুযোগ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে গিয়েছে। তোমরা হয়তো ভাবছ, এতগুলোর মধ্যে কোন কলেজকে বেছে নেবে। সিদ্ধান্তটা কঠিন এবং এখানে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। অনেকেই যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, কাজে তা করেন না। পড়ানোর মান নিচু, গ্রহণযোগ্যতা কম। ফলে চাকরির সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। সবচেয়ে ভালো হয় বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে একবার যাচাই করে নেওয়া। তবে ন্যাশনাল কাউন্সিল স্বীকৃত যে ২৬টা কলেজ রয়েছে সারা দেশে, সেগুলো অবশ্যই উঁচু মানের। বহু বেসরকারি কলেজও যথেষ্ট ভালো। যেমন, তাজ হোটেলের কিছু কোর্স। বিশেষ করে ঔরঙ্গাবাদের এবং সিকিম মনিপাল ইউনিভার্সিটিতে। অন্তত ছাত্র-ছাত্রীরা তাই বলছেন। কারণ অবশ্যই চাকরি, যা সহজেই পাওয়া যাচ্ছে এইসব কলেজের তক্‌মা থাকলে। এবং শুরুতেই বেশ মোটা মাইনে—৬ থেকে ৭ হাজার টাকা। অঙ্কটা কখনও ১৫ হাজার টাকাও ছুঁয়ে যাচ্ছে। আর যদি বিদেশে চাকরির সুযোগ পাও, তাহলে তো কথাই নেই। মোটা পারিশ্রমিকের সঙ্গে থাকছে নতুন দেশের হাতছানি!

জরুরি টেলিফোন নম্বর :

(১) বেঙ্গল ইন্সটিটিউট অব্ হোটেল ম্যানেজমেন্ট •২২৩৭১০০৭ থেকে ০৮ এবং ২২৩৭৭৫৪০।

(২) কলিনেরি ইন্সটিটিউট অব্ ইন্ডিয়া • ৯৫৪৩-২৫৪৮৩৫।

(৩) ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব্ হোটেল ম্যানেজমেন্ট • ২৩৫৭৭৫৫০।

(৪) কল্যাণী ইন্সটিটিউট অব্ হোটেল ম্যানেজমেন্ট •২৫৮২৩৬৩৬।

(৫) ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব্ হোটেল ম্যানেজমেন্ট • ২৪৩৬৯৬৪১।

(৬) ইন্সটিটিউট অব্ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ক্যাটারিং টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড টেকনোলজি • ২৪০১৪১২৪ এবং ২৪০১৪২৮১।

নামাঙ্কন : দেবব্রত ঘোষ

নিবেদন করছে

ACCLARIS
FREEDOM TO FOCUS
www.acclaris.com
Ph. 23673457/58

ধারাবাহিক চিত্রনাট্য সন্দীপ রায়

শালিমার হোটেল। লালমোহনের ঘর।

লালমোহনের লাল সুটকেস, তারপর ঘরের আলমারি খুলে ভিতরের জিনিসপত্তর ঘেঁটে দেখছে হরি।

শালিমার হোটেল। রিসেপ্‌শন।

ফেলু, তোপ্‌সে, লালমোহন সটান হেঁটে এসে—

ফেলু (রিসেপ্‌শনিস্টকে) কুড আই মেক এ লোকাল কল্‌ প্লিজ?

রিসেপ্‌শনিস্ট শিওর, স্যার—

রিসেপ্‌শনিস্ট ফেলুর দিকে ফোন এগিয়ে দেয়।

ফেলু থ্যাঙ্ক ইউ—

লাল (রিসেপ্‌শনিস্টকে) রুম নাম্বার ফোর জিরো টু, প্লিজ—

ফেলু ফোনে নম্বর পাঞ্চ্ করে লালমোহনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেয়।

ফেলু আবার ঘরে কেন ?

লাল (চাবিটা নিয়ে, ফেলুকে) ওয়ান মিনিট!

লালমোহন চলে যায়। ফেলু ফোন ধরে থাকে। পাশে দাঁড়িয়ে তোপ্‌সে।

লালমোহনের ঘর।

হরি টেবিলের দেরাজ খোলে। কোথাও কোনও প্যাকেটের নামগন্ধ নেই। সে ঘড়ি দেখে। তারপর বিরক্ত হয়ে, হাল ছেড়ে দিয়ে, দরজার দিকে পা বাড়ায়।

করিডর।

লালমোহন 'আওয়ারা হুঁ...' গুনগুন করতে করতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

লালমোহনের ঘর।

হরি দরজার কাছাকাছি আসতেই, সেখানে বাইরে থেকে চাবি ঢোকানোর শব্দ!

হরি এক লাফে পিছিয়ে গিয়ে টেবিলে ধাক্কা খায়। তারপর খাটে এক ডিগবাজি খেয়ে তার উল্টোদিকের মেঝেতে পড়ে গা-ঢাকা দেয়।

আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে লালমোহনের প্রবেশ।

এদিকে টেবিলে ধাক্কা খাওয়ার ফলে সেখান থেকে জলের বোতলটা কিন্তু ছিট্‌কে নীচের কার্পেটে পড়ে গেছে!

ঘরে ঢুকে, বাথরুমের দরজা খুলতে গিয়ে লালমোহনের দৃষ্টি চলে যায় সেইদিকে।

লালমোহন এগিয়ে আসে।

খাটের উল্টোদিকে গা-ঢাকা দিয়ে হরি প্রমাদ গোনে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে সে আড়চোখে পাশে তাকায়। তার দু' হাতের মধ্যে লালমোহনের পা এসে দাঁড়ায়। হরি আধবোজা চোখে দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে।

লালমোহন জলের বোতলটা তুলে, তার ছিপিটা ভালোভাবে আটকে, সেটা টেবিলে রাখে। তারপর তার দৃষ্টি যায় খাটের দিকে।

হরির ডিগবাজির ফলে বেড-কভার এলোমেলো। লালমোহন এগিয়ে গিয়ে বিছানার চাদর পরিপাটি করে।

হরি চুপ। লালমোহন এখনও টের পায়নি।

হরি ফের আড়চোখে পাশে তাকায়। খাট ঠিক করে লালমোহনের পা সরে যায়। তারপর নেপথ্যে বাথরুমের দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ।

হরি এবার খাটের উল্টোদিক থেকে তার মুখটা আস্তে আস্তে বার করে উঁকি মারে—ঘর খালি।

হরি হাঁফ ছেড়ে উঠে পড়ে।

শালিমারের বাইরে।

লালমোহন দরজা ঠেলে বেরোয়। হোটেলের সামনে ফেলু, তোপ্‌সে দাঁড়িয়ে।

লাল কী হল?

ফেলু (চারমিনার ধরিয়ে) ওই নম্বরে দেশাই বলে কেউ থাকে না।

লাল (তাজ্জব) অ্যাঁ?!

তোপ্‌সে হ্যাঁ। যিনি থাকেন, তাঁর নাম হচ্ছে পারেখ। এবং গত দশ বছর ধরে তিনি ওই নম্বরেই আছেন।

লাল তাত্...তার মানে...

ফেলু তার মানে সান্যালকে আপনার নেক্‌স্ট গপ্‌পোটা বিক্রি করার আশা ছাড়ুন। কারণ লোকটি অত্যন্ত গোলমেলে। এবং আমার বিশ্বাস, আপনি যে-প্যাকেটটা বয়ে আনলেন, সেটাও অত্যন্ত গোলমেলে।

তিনজন কার-পার্কের দিকে এগোয়।

কপার চিমনি রেস্তোঁরা। দুপুর।

ফেলু, তোপসে, লালমোহন, পুলক একটা টেবিল দখল করে খেতে ব্যস্ত। তাদের পিছনেই একটা স্বচ্ছ কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় রাঁধুনেরা রান্না করছে।

পুলক আগামীকালের শুটিং-এর বিষয় বলে চলে।

পুলক মাথেরন স্টেশন থেকে ভাড়া করা ট্রেন খান্ডালা আর লোনাভলার মাঝে একটা লেভেল ক্রসিং আছে, সেখানে এসে ট্রেনটা থামবে, বুঝলি না! মিস্টার গোরে ট্রেনেই থাকবেন। রেল কোম্পানির সঙ্গে একটা লাস্ট মিনিট ফর্মালিটি সেরে, ওই ট্রেনেই চেপে শুটিং-প্লেসে আসার কথা।

লাল সত্যিই—এলাহি ব্যাপার!

পুলক এলাহি ব্যাপার মানে? আমার আগের ছবির থেকেও এটা মাসিভ্।

লাল তাই?

পুলক হ্যাঁ। দেখিসনি তো?

লাল তোমার কোনও ছবিই দেখার সৌভাগ্য হয়নি—

পুলক ভেরি গুড। আজ সন্ধেবেলা, তুই আর তোর কোম্পানির জন্য 'তীরন্দাজ'-এর একটা স্পেশাল শো-এর অ্যারেঞ্জমেন্ট করিচি। আর. কে. স্টুডিওর প্রিভিউ থিয়েটারে। তোরা গেলেই মাল চালু হয়ে যাবে। জব্বর ছবি, বুঝলি? জুবিলি করেছিল তো!

লাল জুবিলি?

পুলক ইয়েস, স্যার। তবে একটা ব্যাপারে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাঙ্গুইন। এই ছবির ক্লাইম্যাক্স না—'শোলে'-কেও শুইয়ে দেবে!

লাল 'শোলে'?

পুলক হুঁঃ হুঁঃ!

লাল ইয়ে...'শোলে' বলতে মনে পড়ল—আচ্ছা, আমাদের ছবির নামটা কী হচ্ছে?

পুলক ওঃ লালু! এই ছবির নাম ঠিক করতে কম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে! ওফ্! যা ভাবি, তাই দেখি হয়ে গেছে, না-হয় কোনও ব্যাটা রেজিস্ট্রি করে রেখে দিয়েছে। কত বিনিদ্র রজনী যে গেছে এই নাম খুঁজে বের করতে! শেষকালে এই দিন তিনেক আগে—যা হয় আর কী—হাইভোল্টেজ স্পার্ক!

লাল হা-ই...!

লালমোহনের প্রায় বিষম খাওয়ার জোগাড়।

লাল 'হাই ভোল্টেজ স্পার্ক'...ছবির নাম ?!

পুলক খ্যাঁক করে হেসে ফেলে।

পুলক আঃ, লালু ! তোর মাথাটা গেছে! ওই নামে কোনও ছবি চলে? ইনিস্‌পিরেশন—আমি ইনিস্‌পিরেশনের কথা বলছি!

লাল (খানিকটা নিশ্চিন্ত) ওঃ !

পুলক 'জেট বাহাদুর'!

লাল (আবার হোঁচট) অ্যাঁ...?

পুলক তোরা থাকতে থাকতে রাস্তায় হোর্ডিং পড়ে যাবে। ভেবে দ্যাখ্ লালু—তোর গল্পের এমন সুন্দর নাম তুই আর খুঁজে পাবি না!

লাল (হাল ছেড়ে) নাঃ। পাব না !

পুলক অ্যাকশন, স্পিড, থ্রিল—সব পাবি ওই জেট শব্দটার মধ্যে। কী? প্লাস বাহাদুর। নাম আর কাস্টিং-এর জোরে অল সার্কিটস্ সোল্ড! হেঁঃ—

ইতিমধ্যে পুলকের মোবাইল বেজে ওঠে। প্রথমে পুলক ঠিক খেয়াল করে না। পরে তোপ্‌সে তাকে ইশারায় 'ফোন' বলাতে, সে তার নানান পকেট হাতড়ায়। অবশেষে চার নম্বর পকেট থেকে সেটা বেরোয়।

পুলক ডিস্‌প্লেতে নম্বরটা চেক্ করে—

পুলক (ভিজে বেড়াল) ইয়েস স্যার। নো প্রবলেম, স্যার—নো প্রবলেম। (সকলকে) এক মিনিট!

পুলক উঠে পড়ে কিছু দূরে গিয়ে—

পুলক (ফোনে) ইয়েস, স্যার...মাথেরানমে? হেঁঃ, হেঁঃ! সরি, স্যার—!

তোপ্‌সে খেতে খেতে লালমোহনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিস্ করে—

তোপ্‌সে শুধু নাম আর কাস্টিং-ই সব।

ফেলু গল্পের কোনও দামই নেই!

লাল (দীর্ঘশ্বাস) নেই !...

পুলক (ফোনে) জাস্ট এ মিনিট!

পুলক ফিরে এসে লালমোহনকে মোবাইল দিয়ে, চাপা স্বরে—

পুলক অ্যাই লালু—প্রোডিউসার...!

লাল (মোবাইলে) হ্যালো!... ফোর থার্টি?...ও কে... হেঁঃ হেঁঃ—থাঙ্ক ইউ, স্যার...থ্যাঙ্ক ইউ!

পুলককে মোবাইল ফেরত দেয় লালমোহন। মুখে পেল্লায় হাসি।

পুলক কী? গুড নিউজ?

লাল সাড়ে চারটে—শিবাজী কাস্‌ল!

তোপ্‌সে অর্থপ্রাপ্তি?

লাল হেঁঃ। ওই আর কী—!

ফেলু তাহলে আজ ডিনারটা আপনার ঘাড়ে। আর কপার-টপার নয়, একেবারে গোল্ডেন চিমনি!

শিবাজী কাস্‌ল। বিকেল।

গোরের সিটিং রুম।
বেয়ারার পিছু পিছু ফেলু, তোপ্‌সে, লালমোহন এসে ঢোকে।
বিশাল, সুসজ্জিত ঘর।
দামি আসবাবপত্র ছাড়াও মেঝেতে কার্পেট, দেয়ালে পেন্টিং, বুক-শেল্‌ফে সারি সারি বই, প্রোজেকশন টেলিভিশন—সব মিলিয়ে তাক্‌-লাগানো পরিবেশ।

বেয়ারা (ফেলুদের) বৈঠিয়ে—

বেয়ারা চলে যায়।
পশ্চিম দিকটায় সার বাঁধা কাচের জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।
ফেলুরা সেইদিকে এগিয়ে যায়। ফেলু লালমোহনকে দেখে।

ফেলু কী বুঝছেন?

লাল সা-ং-ঘাতিক!

লিফ্‌ট।
খালি লিফ্‌টের দরজা খুলে যেতে আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা শ্যামকে দেখি। হাতে 'গুলবাহার' সেন্ট-এর স্প্রে ক্যান। এবার সে লিফ্‌টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে চারিদিকে বেশ খানিকটা সেন্ট স্প্রে করে দেয়।
লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

গোরের সিটিং রুম।
গোরের পোষা ল্যাব্রাডর এসে ঘরে ঢোকে। ফেলুদের দিকে চায়।
ফেলু, তোপসে, লালমোহন এখনও জানালার সামনে দাঁড়িয়ে।
ফেলু তুড়ি মেরে তাকে ডাকে।
ল্যাব্রাডর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ফেলুর দিকে এগিয়ে আসে।
লালমোহন ভয়ে ফ্যাকাশে মেরে তোপ্‌সেকে জাপ্‌টে ধরে।

তোপ্‌সে (হেসে) শান্ত হন্‌। ভয়ের কিছু নেই।

ফেলু, তোপ্‌সের আদর খায় ল্যাব্রাডর। তোপ্‌সের পিছনে লুকিয়ে আড়ষ্ট লালমোহন।
এমন সময় গোরের প্রবেশ।

গোরে (সকলকে) গুড আফটারনুন! লাঞ্চ ক্যায়সা রহা আপকা?

লাল সুপার্ব!

গোরে তার কুকুরকে ডেকে নেয়।

গোরে হে ক্লিন্ট, ক্লিন্ট! কাম অন্‌, কাম হিয়ার, ক্লিন্ট—

ক্লিন্ট তার মনিবের দিকে পা বাড়ায়।

গোরে (সকলকে) আপলোগ বৈঠিয়ে— প্লিজ, প্লিজ! (ক্লিন্টকে) কাম অন—। আউট, আউট!

ক্লিন্ট চলে যায়।
পুরু গদিওয়ালা সোফায় চারজন বসে।
গোরের পাশের সোফায় লালমোহন, তোপ্‌সে। আর সামনের সোফায় ফেলু।
লালমোহনের খানিকটা আড়ষ্টভাব দেখে গোরে বুঝতে পারে।

গোরে (লালমোহনকে) ইউ ডোন্ট্ সিম টু বি এ ডগ লাভার!

লাল (ঢোঁক গিলে) না...মানে, ইয়ে... ওয়াট ডগ?

ফেলু ল্যাব্রাডর।

গোরে দ্যাট্স্ রাইট। মাই লিট্ল লাব্রাডর

গোরে একটা খাম লালমোহনের দিকে এগিয়ে দেয়।

গোরে দিস্ ইজ ফর ইউ—

মনের জোরে হাত-কাঁপা বন্ধ করে লালমোহন খামটা নেয়।

গোরে (লালমোহনকে) গিন্ লিজিয়ে—

লাল গি-গিন্ব?

ফেলু-তোপ্সের দৃষ্টি বিনিময় হয়।

(এর পরের কথা সবই হিন্দি-ইংরিজিতে চলে। পড়ার সুবিধের জন্য আমরা বাংলার সাহায্যও নেব।)

গোরে (লালমোহনকে) অফ কোর্স। গুনতে তো হবেই। পাঁচশো টাকার তিনশো নোট আছে। অর্থাৎ, দেড় লাখ।

লালমোহন কম্পিত হাতে খাম থেকে এক তাড়া নোট বার করে গোনা শুরু করে।

এক বেয়ারা বাহারের রুপোর টি-সেট-এ চা নিয়ে আসে। সামনের টেবিলে রেখে চলে যায়।

গোরে (সকলকে) লিজিয়ে—

ফেলু, তোপ্‌সে চা নিয়ে—

ফেলু, তোপসে থ্যাঙ্ক ইউ—

লালমোহনের চা নিয়ে গোরে তাকে দিতে যায়।

গোরে ইয়ে আপকে—

লালমোহন হেসে হাত তুলে বুঝিয়ে দেয় যে এখন নয়—গোনার পর।

গোরে ও কে। গিন্ লিজিয়ে—গিন্ লিজিয়ে—!

লালমোহনের সাইড টেবিলে গোরে তার চায়ের কাপটা রেখে দেয়।

গোরে নিজের কাপ তুলে এবার ফেলুর দিকে তাকায়।

গোরে মিস্টার মিত্তর, আপনার কিন্তু পরিচয় এখনও মিলল না!

ফেলু তার একপেশে হাসিটা হেসে—

ফেলু মিস্টার গাঙ্গুলির ফ্রেন্ড—এই আমার পরিচয়।

গোরে হেসে মাথা নাড়ে।

গোরে উহুঁ! দ্যাট ইজ নট এনাফ্। ইউ আর নো অর্ডিনারি পার্সন। আপনার চোখ, আপনার ভয়েস, আপনার হাইট, ওয়াক, বডি—নাথিং ইজ অর্ডিনারি। আপনি যদি আমাকে না-ই বলেন তো ঠিক আছে। কিন্তু শুধু মিস্টার গাঙ্গুলির ফ্রেন্ড বললে কিন্তু আমি মোটেই বিশ্বাস করব না।

ফেলু চায়ে চুমুক দিয়ে—

ফেলু মকাইবাড়ি।

গোরে বাঃ! ঠিক ধরেছেন তো! ওই একটি ব্যাপারে আই অ্যাম ভেরি পার্টিকুলার।

ফেলু আমিও—

গারে রিয়েলি? তো আর কী কী—

গোরের প্রশ্ন শেষ হয় না, কারণ তাকে বাধা দিয়ে লালমোহন বলে ওঠে—

লাল ও কে! থ্রি হান্ড্রেড নোট্স!

গোরে হেসে লালমোহনের দিকে তাকায়।

গোরে ভেরি গুড!

লালমোহন টাকাটা প্যাকেটে পুরে, ঝোলায় ঢুকিয়ে, চা নেয়।

ফেলু ইতিমধ্যে হেঁটে গেছে বুক-শেল্ফের দিকে।

ফেলু (গোরেকে) আপনার অনেক বই আছে দেখছি—

গোরে হাঁ। বাট আই ডোন্ট রিড দেম। পড়ার টাইম কই! ও-সব বই ওনলি ফর শো।

ফেলু একটা 'শরৎ সাহিত্য-সমগ্র' দেখিয়ে—

ফেলু একটা বাংলা বইও চলে এসেছে দেখছি—

গোরে শুধু বাংলা কেন—হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি—সব আছে। আমার এক লোক আছে—বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি—তিনটে ভাষা জানে। ওই তিন ভাষায় নভেল পড়ে আমাকে সিনপ্সিস্ করে দেয়। (লালমোহনকে) ইন্ ফ্যাক্ট—আপনি যখন আপনার ম্যানুস্ক্রিপ্ট পাঠালেন না—তারও একটা আউটলাইন করিয়ে পড়েছি আমি।

লালমোহনের হঠাৎ কী মনে হওয়াতে, চায়ের কাপ পাশে রেখে—

লাল ওয়েট। লেট মি গিভ ইউ দ্য পাবলিশ্ড বুক!

লালমোহন তার ঝোলায় হাত ঢোকায়—

লাল মানে, হেঁঃ! ফর ইওর কালেক্শন আর কী...!

লালমোহন একটা ব্রাউন প্যাকেট বার করে গোরেকে দেয়।

লাল মাই রহস্-রোমাঞ্চ উপন্যাস নম্বর থার্টি-টু—

গোরে (প্যাকেট নিয়ে) থ্যাঙ্ক ইউ!

লাল সেলিং লাইক হট্ কচু—

লালমোহনের কথা মাঝপথে আটকে যায়। কারণ গোরে প্যাকেট খুলে যে-বইটা বার করেছে, সেটা আদৌ 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' নয়, শ্রীঅরবিন্দর 'লাইফ ডিভাইন'! (চলবে)

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়। আলোকচিত্র : হীরক সেন

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' চিত্রনাট্যের আগের পাঁচটা কিস্তির সব সংখ্যা এখনও কিছু পাওয়া যাচ্ছে। আগাম টাকা পাঠালে, বাড়িতে বসেই পেয়ে যেতে পারো। সরাসরি ফোন করো 'সন্দেশ'-এর সার্কুলেশন বিভাগে : ৯৪৩৩১১২৬০৭। অথবা চিঠি লেখ 'সন্দেশ'-এর ঠিকানায় : ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড। কলকাতা ৭০০০২০। কিম্বা ই-মেল করো : sandesh1913@yahoo.co.in

হাত পাকাবার

বদমাইশ হনুমান

রিখিয়া ভুক্ত

গ্রাহক সংখ্যা ৪০৯৫। বয়স ৮ বছর

একটা আমগাছে একটা বদমাইশ হনুমান থাকত। একদিন আর-একটা বদমাইশ হনুমান সেই গাছে আম খেতে এলো। আম খেতে এসে সে হনুমানটাকে ওর বন্ধু হতে বলল। হনুমানটা রাজি হয়ে গেল। তখন থেকে দু'জনে ওই আমগাছে বাস করতে লাগল। কয়েকদিন পর একজন লোক গাছটার নীচে একটা বড় বাড়ি করল। একদিন হনুমানরা শুনল যে, বাড়ির লোকেরা বলাবলি করছে যে, কাল সবাই মিলে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবে। তাই শুনে হনুমান-দুটো ঠিক করল—ওরাও তাহলে কাল বাড়িটা দেখতে যাবে।

পরের দিন বাড়ির লোকেরা চলে গেলে, ওরা বাড়িতে এসে ঢুকল। ঢুকেই ওরা ভাবল রান্না করে খাবে। তাই ওরা রান্নার জোগাড় করতে লাগল। একটা হনুমান উনুন ধরাতে গেল। আর অন্য হনুমানটা মশলা আনতে গেল। দ্বিতীয় হনুমান মশলা আনতে গিয়ে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। এদিকে প্রথম হনুমানটা লাইটারের মুখটা নিজের দিকে করে লাইটারটা জ্বালল, আর সঙ্গে সঙ্গেই আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুন দেখে এত ভয় পেয়ে গেল যে, সেটা পর্দার দিকে ছুঁড়ে দিল। আর যেই-না দেওয়া, অমনি দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল পর্দাটা।

হনুমানটা তখন চিৎকার করছে, 'আগুন, আগুন। বাঁচাও, বাঁচাও।'

এদিকে প্রথম হনুমানটা ভাবল, নিশ্চয় আগুন লেগেছে। ভাবা মাত্র সে বাথরুমে গিয়ে এক বালতি পচা জল নিয়ে, সেই ঘরে গিয়ে জলটা ঢেলে দিতেই আগুন নিবে গেল। তখন সে বলল, 'চল, আমরা পালাই।'

কিন্তু পালাতে আর পারল না। কারণ, তার মধ্যেই বাড়ির লোকেরা এসে পড়ল। এসে ওদের ওই কাণ্ড দেখে হনুমানদের এমন পেটাল যে, ওরা ওই আমগাছ ছেড়ে অন্য গাছে গিয়ে বাস করতে লাগল।

আর ঠিক করল যে, ওরা আর-কোনও দিন ওরকম দুষ্টুমি করবে না।

আ র শো লা

শঙ্খশুভ্র মল্লিক

গ্রাহক সংখ্যা ৩৭৯১। বয়স ১৪ বছর

রাজার মনে সুখ নেই। তা সুখেরই বা দোষ কী! ব্যাপারটা খুলেই বলি। সেদিন সকালবেলা উঠে খাটের পাশে রাখা নতুন হিরে-বসানো পাগড়িটা তুলে পড়তে গিয়ে রাজার চোখ পড়ল—পাগড়িটার মাথার ময়ূরের পালকটার ঠিক উপরে—হ্যাঁ, কে-যেন ওখানে বসে আছে। মাঝে মাঝে শুঁড়টা একটু নড়ছে। একবার বোধহয় ডানাও ঝাপটালো। ব্যস, রাজাকে আর পায় কে? তিনি বিশাল এক চিৎকার ছেড়ে পাগড়িটাকে খাটের উপরে রেখে, এক লাফে মাটিতে পড়েই খাটের তলায় গিয়ে সেঁধোলেন।

এত লম্ফঝম্পে টাল সামলতে না-পেরে মাটির কুঁজোটা সোজা কুমড়োর মতো গড়িয়ে গেল। আর গড়াবি-তো-গড়া একেবারে রাজবেশটার ঘাড়ে। ব্যস, আরেক প্রস্থ হুঙ্কার।

রাজা রেগে আগুন হয়ে বেরিয়ে এলেন। কালকেই ওটাকে ড্রাই ক্লিনিং করিয়ে এনেছেন। আর-এক সেট ধোপার বাড়িতে,

আসময়

নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়

তার ডেট-এর আগে তো পাওয়া যাবে না। তো এখন রাজা সভায় যান কী পরে?

ভাবনার মধ্যেই চোখ গেল খাটের উপর। তিনি তখনও রাজার ক্ষতির দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না-করে, শুঁড় দুলিয়ে চলেছেন। রাজা ভীষণ রেগে দেওয়ালের কোণে রাখা খাপ থেকে তরবারি বের করে খাটের উপর চালালেন। আরশোলাটা সামান্য সরে গেল, যেন আড়মোড়া ভাঙল। তলোয়ারের কোপে বিছানার গদি-তোষক ততক্ষণে আধখানা। রাজার রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি এবার তলোয়ারটাকে মাথার উপর একপাক ঘুরিয়ে, কানের পাশ দিয়ে নামালেন। এবার একটু কাছাকাছিই গেল। আরশোলাটাকে নড়তেও হল না। লাভের মধ্যে রাজার অনেক দিনের অনেক কষ্টের তৈরি পাকানো গোঁফের আধখানা গেল উড়ে।

রাজা সাধের গোঁফে হাত দিয়ে 'আ-উ-উ... বলে ডাক ছেড়ে মাটিতে বসে পড়লেন। আর এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন রাজার পিসি, হাতে এক হাঁড়ি দই। রাজার প্রাত্যহিক ব্রেকফাস্ট। পিসির প্রথমেই চোখ গেল খাটের উপর, পরক্ষণেই এক লাফ। হাত থেকে দইয়ের ভাঁড় ছিটকে পড়ল রাজার পাগড়ির ঘাড়ে। নতুন কেনা পাগড়িটার শোকে রাজা কেঁদে ফেললেন। না, আরশোলাটার বোধহয় এতসব কাণ্ড পছন্দ হল না। সে দু'-একবার এদিক-সেদিক তাকিয়ে, গুটি গুটি পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজা মেঝে থেকে উঠেই হুঁঙ্কার দিয়ে জরুরি সভা ডাকলেন। মন্ত্রীমশাই তখন দাড়ি কামাচ্ছিলেন। সবে সাবন ঘষেছেন, তখনও ক্ষুর ছোঁয়াননি, এমন সময় প্রতিহারী এসে হাঁক পাড়ল। মন্ত্রীমশাই সে-অবস্থায় ক্ষুর হাতেই রাজবাড়ির দিকে ছুট লাগালেন। রাজপণ্ডিত সবে তাঁর প্রাত্যহিক প্রাতঃ-প্রাণায়াম সেরে 'গীতা' নিয়ে বসেছেন। এমন সময় তার কাছেও তলব। তাড়াতাড়িতে 'গীতা' গিয়ে পড়ল সামনে রাখা কোষাকুষির গঙ্গাজলে। কোনওমতে সেটিকে আর পাঁজিটি বাগিয়ে, তাপ্পিমারা ছাতাটা বগলে নিয়ে দৌড় লাগালেন।

রাজসভায় ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে। জরুরি তলব বলে কথা। পাত্র-মিত্র, ডাক্তার-মোক্তার, আমির-ওমরাহ, মন্ত্রী-যন্ত্রী সক্কলে হাজির। ফিসফাস গুজগুজ। এমন সময় রাজা ঢুকলেন, কোনওরকমে একটা আলখাল্লা ধোপার কাছ থেকে ম্যানেজ করেছেন। আধখানা গোঁফও কামানো হয়ে গেছে। তবু মুখের দিকে তাকিয়ে 'কী নেই, কী নেই' ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছে না। যদিও চেহারা বেশ খোলতাই হয়েছে। তাছাড়া দারোগা আর রাজাদের গোঁফ না-হলে মানায় নাকি?

সিংহাসনে বসেই রাজা আর-এক হুঁঙ্কার ছাড়লেন। মন্ত্রীমশাই ভয় পেয়ে চমকে গিয়ে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়লেন। ফিসফিস বন্ধ। সভা স্তব্ধ। রাজা গম্ভীর মুখে সকালের ঘটনাটি ব্যক্ত করলেন। তৎক্ষণাৎ ওই দুর্বিনীত আরশোলাটিকে ধরে এনে, তার উপযুক্ত শাস্তির বিধান চাইলেন। এদিকে ভাবতে ভাবতে পাত্র-মিত্র মাথা চুলকে টাক পড়িয়ে ফেললেন। ভীষণ দুশ্চিন্তায় মন্ত্রীমশাইয়ের দাড়ির সাবান ঘামে ধুয়ে গেল। ডাক্তারের মাথাভরা টাকে চুল গজিয়ে গেল। এমনকী মোক্তার গোঁফে বার বার চাড় দিয়ে দিয়ে আধখানা গোঁফই উড়িয়ে দিলেন। রাজা নিজেও গোমড়া মুখে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন। কিন্তু কোনও সুরাহা হল না।

এমন সময় মন্ত্রীমশাইয়ের নাকের ডগা দিয়ে তাঁর বিস্ফারিত নেত্রের সামনে কে-যেন 'ফুড়ুৎ' করে উড়ে গেল। সেদিক পানে চোখ পড়তেই রাজা এক লাফে সিংহাসন থেকে নেবে, তার তলায় গিয়ে সেঁধোলেন। মন্ত্রীমশাইও বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না-করে তাকে অনুসরণ করলেন। এদিকে তিনি তখন সারা ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছেন। পাত্র-মিত্র যে-যেখানে পারলেন হুড়মুড় করে লুকোতে গিয়ে রাজার অনেক সাধের দু'টি মমর পরীমূর্তির একেবারে তেরোটা বাজালেন। মোক্তার এক স্বর্ণকলসের ঢাকায় ধাক্কা খেয়ে মাথা ফাটালেন। যন্ত্রী কোথাও লুকোতে না-পেরে, থামের আড়ালে নিজের মুখটাকে গুঁজে দিল। সে এক স্থূলস্থূল কাণ্ড!

এদিকে তিনি তখনও উড়ে চলেছেন। আর রাজপণ্ডিত হাতের কাছে কিছু না-পেয়ে, প্রবল বিক্রমে চোখ-কান বুঁজে নিজের অজান্তে

শঙ্খশুভ্রর আঁকা ছবিটা চমৎকার। কিন্তু বিকেলবেলা পায়ে-ব্যান্ডেজ রাজার গোঁফ এলো কোত্থেকে? স স।

হাতের পাঁজিটাকেই ছুঁড়ে মারলেন। আরশোলাটা নিজের জায়গাতেই রইল আর দশ হাত দূর দিয়ে পাঁজিটা উড়ে গিয়ে লাগল রাজার ঠাকুর্দার আমলের মস্ত ঝাড়লণ্ঠনটায়। আর সেটা ভেঙে পড়ল সভার মাঝখানে। ব্যস, চারিদিক কাচে কাচ। সেনাপতি এরিমধ্যে তলোয়ার বার করে রাজপণ্ডিতের কাছ থেকে সকালের জলে-ভেজা 'গীতা'টাকে কেড়ে নিতে এগিয়ে এলেন। যাতে এই অসম দ্বন্ধযুদ্ধে তাঁর অবশ্যম্ভাবী পরাজয় ঘটলে, অন্তত 'গীতা' হাতে স্বর্গলাভ করতে পারেন।

এদিকে আরশোলাটাও বোধহয় এবার একটু ভয় পেয়ে থাকবে। সে উড়ে গিয়ে সিংহাসনের তলায় ঢুকবার চেষ্টা করল। সেনাপতি তার পিছনে। আরশোলাটা মাঝখান থেকে সরে গেল, আর রাজা, মন্ত্রীমশাই ও সেনাপতির মুখোমুখ ধাক্কা। হ্যাঁচোর প্যাঁচোড় করে কোনওরকমে বেরোতেই, রাজার নাকের ডগা দিয়ে তিনি উড়ে গেলেন। সেনাপতি এক লাফে রাজার ঘাড়ে উঠে তলোয়ার চালালেন। আরশোলাটা আর রাজার নাকটা দু'জনেই অল্পের জন্য বেঁচে গেল। আর সেনাপতি নিজ কৃত কর্মের ভয়ে অজ্ঞান হয়ে সেখানেই পড়ে গেলেন। আর রাজা? তিনি ধাক্কা খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে সোজা গিয়ে পড়লেন ঝাড়লণ্ঠনের ভাঙা কাচের উপর । ব্যস, উঠতে যেতেই দু'পায়ে কাচ বিঁধিয়ে, তিনি পড়ে রইলেন সভার মাঝখানে।

বিকেলবেলা গোমড়া মুখ করে বিছানার উপর শুয়ে, ঠ্যাঙটা পাশবালিশের উপর তুলে দিয়ে, রাজামশাই ক্ষতির হিসেব মেলাচ্ছিলেন। ভয়ের চোটে মন্ত্রীমশাই আর সেনাপতি শয্যা নিয়েছেন। কাজে আসতে পারবেন না। মোক্তার ভীষণ জ্বরে উঠতে পারছেন না। রাজপণ্ডিত 'গীতা'র শোক ভুলে গেছেন। সিংহাসন দু'-টুকরো। রাজার এক মাস বিছানা ছাড়া বারণ। ডাক্তার এসে পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছেন। ওদিকে সভা বিধ্বস্ত। লোক লেগেছে। মাস না-পুরলে হবে বলে তো মনে হয় না।

মনের দুঃখে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলতে যেতেই রাজার চোখ পড়ল নিজের বুকের উপর। মনে হল কে-যেন ডানা ঝাপটালো, শুঁড়টা দু'বার নাচাল। রাজা রেগেমেগে তলোয়ারটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে কোপ বসাতে গিয়েই কী যেন ভেবে থেমে গেলেন। মুখটা কেন জানি শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

আর আরশোলাটা রাজার মুখের ভাবখানা দেখে ফিক্ করে একবার হেসে, বার দুয়েক পিছনের পা-টা নাচিয়ে, ডানা ঝাপটে জানলা দিয়ে উড়ে গেল।

আজকাল প্রকাশন-এর

খেলা

এখন পাক্ষিক ~~১৪~~ অন্যরকম চেহারায়

দেশ-বিদেশের খেলাধুলোর খবর
তারকাদের রঙিন ব্লো-আপ।
আকর্ষণীয় ফিচার।
বিষয়-বৈচিত্র্যে অসাধারণ।

৮ টাকায় ৪৮ পাতা

পারী থেকে পরী, ডাইনি, পঁয়ষট্টি হাসি

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

লা সরসিয়ের দ্য লা রু মুফতার। পিয়ের গ্রিপারি
ফোলিও জুনিয়র। প্যারিস। ৪০ ফ্রাঁ

এক যে ছিল নগরী, যার নাম পারী।
ছিল এক সড়ক, নাম ব্রোকা।
ছিল কাবলেদের এক কাফে।
ছিলেন মহাশয়, মঁসিয়ুর পিয়ের।
আর ছিল এক বাচ্চা ছেলে, সবাই ডাকে বশির।
ছিল বটে তিনটি খুকিও।
আর যা ছিল, তা শুনে গায়ে কাঁটা, তবু জানতে কে-না চায়!

এক হল এক ডাইনি। দুই, এক দত্যি। ছিল এক জোড়া জুতো। হিল্লি-দিল্লি করা এক পুতুল, এক পরীও। আর এ-সব পড়ে যদি মনে হয় গপ্‌পো কথা, তবে সত্যিকার কাহিনি নিয়ে হাজির লুসতুক্‌রু আর মিশেল মাসি।

আর এদের নিয়েই পিয়ের গ্রিপারির দেদার মজার পাগলা বই 'লা সরসিয়ের দ্য লা রু মুফতার'। অর্থাৎ, 'মুফতার রোডের ডাইনি'। শিরোনামের নীচে ছোট্ট একটা সংযোজনও আছে : 'ত্র ওএ্ কোঁৎ দ্য লা রু ব্রোকা'। অর্থাৎ, 'এবং ব্রোকা সরণির আরও-সব গল্প'।

ব্রোকা কেবল সরণিই নয়, এক পল্লি বিশেষ। সে-পাড়ারই একটা রাস্তা মুফতার। যে-রাস্তার বাসিন্দা বইয়ের ডাইনিবুড়ি। বইয়ের মতন ব্রোকা পল্লিও এক পাগলা পাড়া। সেখানে কী যে ঘটে, আর কী করেই যে ঘটে, কিংবা কেনই-বা ঘটে, তা আমাদের ঘটের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা দায়!

ব্রোকা পল্লির চরিত্রদের বোঝা তো পরের কথা, ব্রোকা পল্লিই যে পারী নগরীর কোনখানে, সেটা খুঁজে বার করতে পাগল হওয়ার উপক্রম হয় আমাদের। যদিও লেখক তাঁর বইয়ের দীর্ঘ ভূমিকায় একটা নির্দেশিকা দিয়ে রেখেছেন সেখানে পৌঁছনোর। অমন এক স্ট্রিট-ডিরেকশন সম্বল করে যে-কোনও দিকশূন্যপুরে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। তবে ব্রোকায় পৌঁছনো হবে কিনা, সে এক মহামতি আইনস্টাইনই বলতে পারেন।

হঠাৎ আইনস্টাইনের নাম এলো কেন ? এলো, কারণ, রু ব্রোকা কোনও যে-সে রাস্তা নয়। লেখক বলছেন, 'অন্য কোনও রাস্তার সঙ্গে এর তুলনাই চলে না। যদি পারীর কোনও ম্যাপ হাতে নেন, তো দেখবেন—কিংবা দেখছেন বলে মনে হবে—রু ব্রোকা আর রু পাস্কাল পোর-রয়াল নামের মহাসরণিতে গিয়ে ঠোকাঠুকি খেয়ে এক সমকোণ সৃষ্টি করেছে। এবার আপনার গাড়ি নিয়ে পারীর মানমন্দির এবং গোবল্যাঁ-র মধ্যে যত্ত খুশি পাক খেতে থাকুন : কী ব্রোকা, কী পাস্কাল—কোনওটারই হদিশ করতে পারবেন না!'

তাহলে রাস্তা দুটো কি মিথ ? নেহাতই কল্পনা ? 'আরে না মশাই, না!' বলবেন লেখক, 'দিব্যি আছে হেলেদুলে। দেখবেন ? দেখুন, কোথায় বুলভার আরাগো আর রু ক্লোদ-বেরনার কাটাকুটি খেলছে বুলভার দ্য পোর-রয়ালকে নিয়ে। পেলেন ? পেলেন না তো ? পাবেন কী করে ? হাতের ম্যাপটা তো দ্বিমাত্রিক! আইনস্টাইন সাহেবের মহাবিশ্ব পারীর ওইখানটায় এসে একটা বাঁক নিয়েছে, ফলে এমন ঢেউ খেলে গিয়েছে স্থান কাল পাত্রে, যে, ও-নিয়ে কিছু বলতে গেলেই সায়েন্স ফিকশনের কথাবার্তা এসে পড়ছে। শেষে দাঁড়াচ্ছে রু ব্রোকা আর রু পাস্কাল আসলে একটা গর্ত, এক শূন্য খাঁচা, থার্ড ডাইমেনশনের সাবস্পেস-এ এক মস্ত ঝাঁপ!'

তাই এবার গাড়ি ছেড়ে, পায়ে হেঁটে... না, থাক। লেখক পিয়ের গ্রিপারির বিবরণ পড়ে ব্রোকা পল্লির অন্তর্গত রু মুফতার খোঁজার চেয়ে ঢের সোজা—ওঁর গল্পগুলো ধরে পাড়াটার জীবন ও জগতে ঢুকে পড়া। পাড়ার চেহারা ও সেখানকার চরিত্রগুলো কেমন, তাও দিব্যি ধরিয়ে দেন বইয়ের চিত্রশিল্পী পুইগ রোসাদো।

তবে বইয়ে ঢোকার আগে আরেকটু সময় নিই ? পরিচয় করিয়ে দিই লেখক ও শিল্পীর সঙ্গে। লেখক পিয়ের গ্রিপারির জন্ম পারীতে, ১৯২৫ সালে। মা ছিলেন ফরাসিনী এবং পিতা গ্রিক। ১৯৬৩তে গ্রিপারি তাঁর আত্মজীবনী লিখে বসেন, নাম

দেন 'পিয়েরো লা লুন'। ফরাসি চিত্রপরিচালক জ্যঁ লুক গোদারের বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'পিয়েরো ল্য ফু'র সঙ্গে নামের এই মিল কেন, কে জানে! 'ফু' শব্দের অর্থ উন্মাদ, আর 'লুন'-এর মানে চাঁদ। আর চাঁদ আর উন্মাদে... না, থাক সে-কথা। এরপর গ্রিপারি একটা নাটক লেখেন 'লিউতেনঁ তনঁ'। তারপর তো ছোটদের জন্য একটার পর একটা উপন্যাস, আজব কাহিনি, গপ্‌পোগাছা লিখেই গেছেন। 'মুফতার রোডের ডাইনি' দিয়ে সেই-যে শুরু করলেন ব্রোকা পল্লির গল্প, তার যেন আর শেষ নেই। ছেলেপুলেরা পাগল, বড়রাও পাগল, অথচ ইংরেজি অনুবাদে এরা এ-দেশে এসে পৌঁছয়নি। মূল ফরাসিতে এইসব গল্প পড়ে চমকে গিয়েছি। মনে হচ্ছে, এর কিছু নমুনা 'সন্দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার।

চিত্রকর পুইগ রোসাদোর জন্ম ১৯৩১-এ, স্পেনের দন বেনিতো এলাকার এক গ্রামে। ১৯৬০ সাল থেকে ফ্রান্সে বসবাস করেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত দুই পত্রিকা 'ল্য নুভেল অবজরভাতর' এবং 'কানার অঁশেনে'তে ছবি এঁকে আসছেন কাজের জীবনের প্রথম থেকেই। এছাড়াও তিনি বিজ্ঞাপন, বই, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে কাজ করে আসছেন। ওঁর আঁকা ছবি নানা দেশের চিত্রশালায় শোভা পাচ্ছে। রু ব্রোকার কাহিনিরাজিতে কাজ ওঁকে অমরত্বই দিয়েছে বলা যায়।

ভূত-পেত্নি, দত্যি-দানো আর ডাইনির গপ্‌পোর কি কোনও মৃত্যু আছে ? তবে এদের চলাফেরা গাঁয়ে-গঞ্জে, বনে-বাদাড়ে, ডাকবাংলো আর জেলাশহরে। কলকাতাতেও এদের জায়গা করে দেওয়া খুব সহজ হয়নি। আর সেখানে ভাবো পারী! ফলে লেখক তাঁর ডাইনিকে বেশ কায়দাটায়দা করে শহুরে, আর যেহেতু প্যারিসবাসিনী, তাই রূপ ও ফিগার নিয়ে বেজায় চিন্তিত, রীতিমতো মনস্তত্ত্বপীড়িত করে দাঁড় করিয়েছেন। সাইকোলজিকাল ক্রিচার আর কী!

তো এই মোটা ক্যাঁদা বুড়ি ডাইনির শখস্য শখ—সে দুনিয়ার সেরা সুন্দরী হবে। হবে কী হবে না পরের কথা, দুনিয়া যেন স্বীকার করে নেয়—হ্যাঁ, এ-ই বটে ক্লিওপাট্রা কী হেলেন কী কাতরিন দনোভ। তবে কী, দুনিয়া তো তখনই স্বীকার করে নেবে, যখন ডাইনি সত্যিই সেরা ডাইনি, থুড়ি, সেরা সুন্দরী হবে। কিন্তু হবেটা কী করে ?

এমন সময়, একদিন, ডাইনিদের নিজস্ব পত্রিকা 'জুর্নাল দে সরসিয়ের'-এ একটা খবর বেরুল। আসলে দেদার জরুরি একটা তথ্য :

মহাশয়া,
যদি আপনি হন বুড়ি এবং মোটা
কিন্তু হতে চান ছুঁড়ি এবং রূপসী
তাহলে
খেয়ে ফেলুন একটা বাচ্চা মেয়ে ধরে
টোম্যাটো সস-এ চুবিয়ে!

আর তার নীচেই খুদে খুদে হরফে : তবে হ্যাঁ, সেই খুকির নামের আদ্যাক্ষর হতে হবে 'এন'!

আর যায় কোথায়! বুড়ি তৎক্ষণাৎ হণ্টন লাগাল 'এন' আদ্যাক্ষরের কচি খুকি ধরতে। পেয়েও গেল পাড়ার মুদি সইদের মেয়ে নাদিয়াকে। তাকেই পাঠাল আব্বার দোকান থেকে টোম্যাটো সস জোগাড় করতে। শুরু হয়ে গেল আট আটে চৌষট্টি হাসি আর বাহান্ন ঝামেলার গপ্‌পো! কিন্তু আমি সেই ডিটেলে যাবই না। এই

চিত্রকর পুইগ রোসাদো এঁকেছেন লেখক পিয়ের গ্রিপারি এবং স্বয়ং নিজেকে।

গপ্‌পো শোনার জন্য যদি খুব ব্যাকুল হও, তাহলে 'সন্দেশ'-এর কাছে বায়না ধরো, আমি ভাষান্তর করে শুনিয়ে দেব আগামী কোনও সংখ্যায়।

এরপর আছে লাল জুতোর দৈত্য, যে ছিল তিনতলা সমান লম্বা, আর থাকত মাটির নীচে। একদিন সে ভাবল, আর তো পারা যায় না। এভাবে কি ছেলেবেলাতেই আটকে থাকব ? এরপর সে জগদ্দর্শনে বেরুল। তিন মাস ধরে যাত্রা করে পাড়ি দিল চীন। যেতে যেতে চীনা ভাষাটাও শিখে নিল এবং চীন পৌঁছে সেখানকার পয়লা নম্বর জাদুকরের বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়ল। সে জাদুকর দরজা খুলে তেতলা সমান দত্যিকে দেখে তো তাজ্জব! দৈত্য বলল, 'ইয়ং চোচোচো কং কং এনগো!' যার মানে, 'তাহলে আপনিই সে মহান জাদুকর ?'

তা শুনে জাদুকর ধীরে ধীরে, এক ভিন্ন স্বরে বলল, 'ইয়ং চোচোচো কং কং এনগো।' যার মানে দাঁড়াল : 'হ্যাঁ, আমি তিনিই বটে। তো ?' তোমরা ভাবতে পারো, আরে, একই কথার দু' রকমের মানে কেন ? তাই লেখক ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে টুক করে খোলসা করে দিয়েছেন—চীনা ভাষাতে এটাই চলে। একটি বাক্যেই সব কথা বলে দেওয়া যায়, শুধু গলার স্বর বদলে বদলে যেতে হবে।

এরপর 'ইয়ং চোচোচো কং কং এনগো' করে যে কী বাতচিত হল দৈত্য আর জাদুকরে, তা বলে বোঝানো মুশকিল। বিরল অনাবিল হাসির এই টানাপোড়েন থেকে বেরুনো চ্যাপলিনের ছবিতে গুম মেরে বসে থাকার মতো কঠিন। এরপর তো দৈত্য গেল রোমের পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। না-না, সদ্য প্রয়াত পোপ দ্বিতীয় জন পল নন। তিনি প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় কে বলা নেই, তবে তাঁর সামনে দৈত্যর তুলে ধরা সমস্যা বাস্তবিকই দৈত্যকায়। দৈত্য বলল, 'পোপ মহাশয়, আমায় দয়া করবেন। ১৪ দিন ধরে আমার বাগদত্তা বিয়ের অপেক্ষায়। কিন্তু আমার এই হাইট নিয়ে তো কোনও গির্জাতেই মাথা গলাতে পারছি না!'

না, এরপর আর বলব না। বরং ছুঁয়ে যাই মঁসিয়ুর পিয়েরের গল্পটা। যিনি একদিন মোটে পাঁচ ফ্রাঁ দিয়ে কিনে বসলেন এক দুর্দান্ত ফ্ল্যাট। পাঁচ ফ্রাঁ-তে ফ্ল্যাট! পাগল নাকি ? ফ্ল্যাট তো বটেই, তাতে নেই-টা কী ? প্রথমত, সেটা ফ্ল্যাট নয়, ছোট্ট বাড়িই একখান। তাতে আছে শোবার ঘর, রান্নাঘর, চানঘর, বসার ঘর, ধূমপানের ঘর, আর একটা ঝাড়ু রাখার আলমারি। ঝাড়ু রাখার আলমারি কেন ? কী মুশকিল, বাড়ির ডাইনি তাহলে উড়বে কীসে!

সাত-সাতটা গল্পে ভরানো বইটা সহজে সাত পাকে বাঁধে পড়ুয়াকে। গপ্‌পো হচ্ছে সত্যি দানো ডাইনির, আর তার মধ্যেই কী সুন্দর ফুটে উঠছে ব্রোকা পল্লির মানুষজনের কথাবার্তা, চেহারা চরিত্র। কত রকমের মানুষ সব! আছে কাবলেরা, আছে হিস্পানিরা, আছে পর্তুগিজ, ইতালীয়, পোলিশ, রুশ, মিশ্র ফরাসি আর খাঁটি ফরাসি। ব্রোকা পল্লির এইসব লোকজনের একটাই বড় লক্ষণ—এরা গপ্‌পো শুনতে বড্ড ভালোবাসে। পিয়ের গ্রিপারি দেখালেন এদের মধ্যেও কত গপপো!

পড়ুয়ারা প্যারিস চষে বেড়িয়েও যদি রু ব্রোকা কী রু মুফতার খুঁজে পান বা না-পান, গ্রিপারির বইটি আগলে দিব্যি জমা পড়বেন সেখানে। 'সন্দেশ'-এর খুদে পড়ুয়াদের যারা কখনও প্যারিস যাবে, তাদের জন্য একটাই সতর্কবার্তা : গ্রিপারির এই কেতাবসমূহ না-পড়ে, পারী পাড়ি দিও না। সুন্দরী নগরী, ভালো খাবারদাবার, চমৎকার সেন্ট-পার্ফিউম, পোশাকআশাক, গান-বাজনা, সিনেমা ও থিয়েটার সব পাবে, কিন্তু ডাইনির হদিশ মিলবে না! দত্যি-দানোর দেখা পাবে না! পরী আর পারী যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, তাও বিশ্বাস হবে না।

নামাঙ্কন : সৌমিত্র সোম

Dabur

Celebrate Life!

Celebrate the goodness of nature.
Celebrate a new spirit.
Celebrate a new beginning.

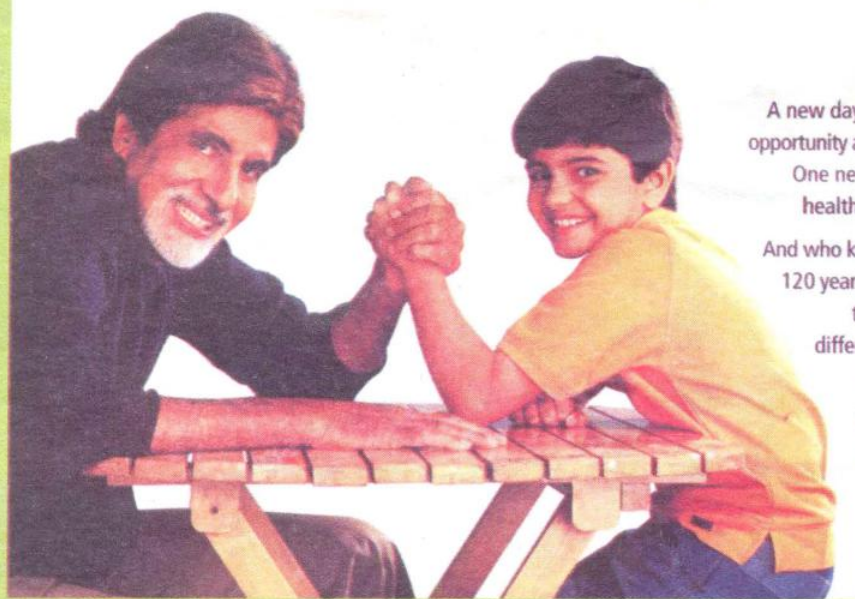

A new day, a new challenge, a new opportunity and living life to the fullest. One needs to be prepared. To be healthy both in mind and body.

And who knows it better than us. For 120 years Dabur has been bringing the goodness of nature in different forms to help you be healthy and stay ahead.

With these wishes we, at Dabur, now come to you in a new form to help celebrate health. Celebrate life.

গৌরী ধর্মপাল

অলখ নিরঞ্জন

মৌমাছি গুনগুন করছে।
কোথায় বসবে এখনও ঠিক করেনি।
পরাগে না পাপড়িতে না মধুতে?
শেষপর্যন্ত মধুতে বসল।
বসে-টসে একটা ছোট্ট এতটুকুন মুড়ি মুখে নিয়ে এলো ঋকুবাড়ি।

বারান্দায় দুরবিন বসানো। পাখার ঝঙ্কারে তার মাছি নাড়িয়ে নাড়িয়ে নিশানা ঠিক করে, দূর-চোখ দিয়ে মৌ দেখল সূর্য উঠছে। চারিদিক আলোয় আলো।

মউ মুড়ি খাচ্চে। বুলবুলি গান করচে। ঋকু আঁকচে। সুজ্‌জি আলো ফেলচে যেখানে যেমন দরকার। আঁধার সরিয়ে সরিয়ে। সুজ্‌জির আশপাশ দিয়ে অলখ নিরঞ্জনের নীল আলো এসে পড়ছে খাতায় পাতায় গাছে মূলে
স র্ব ত্ত র

অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

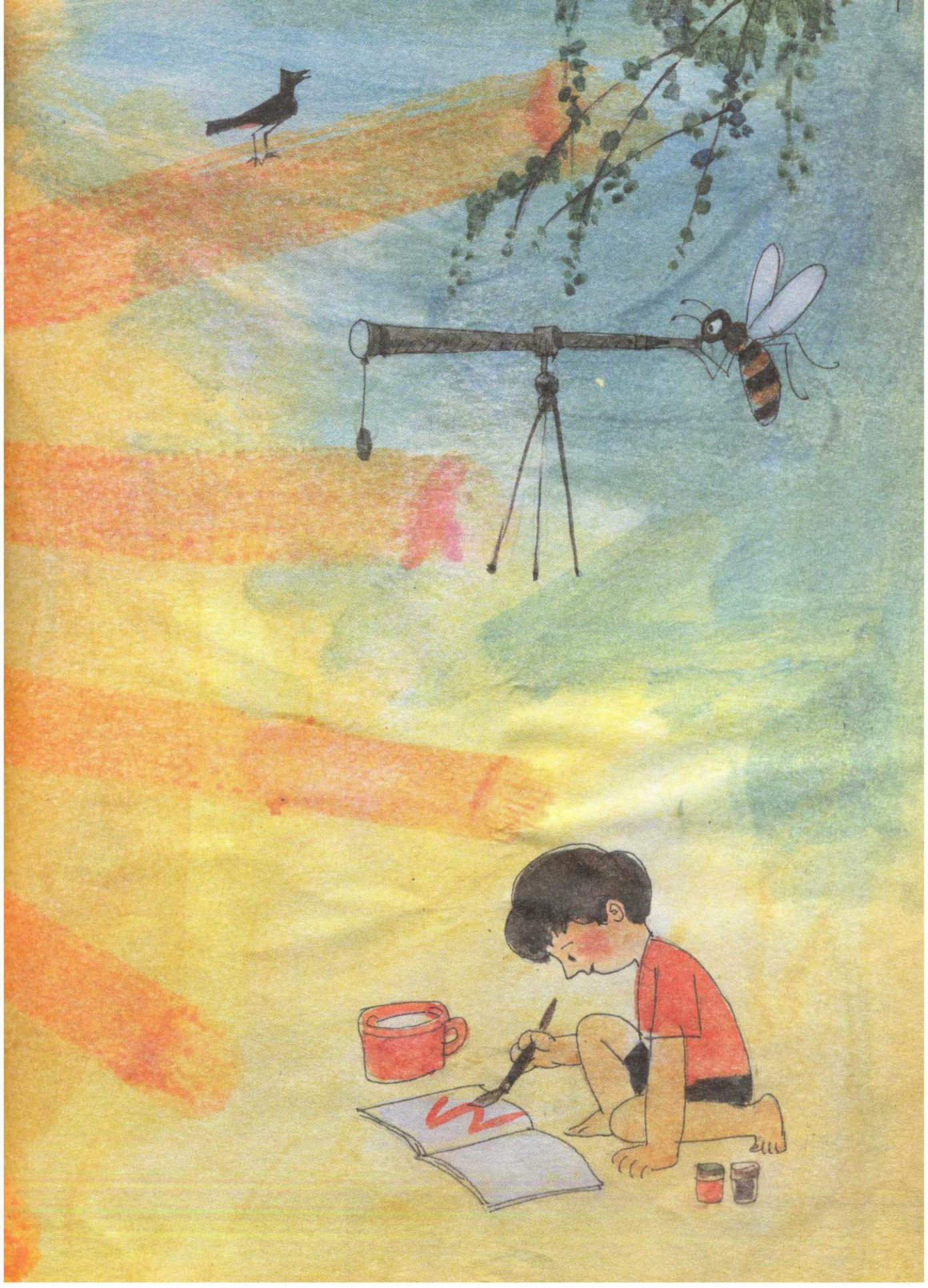

রান্না বান্না

রাজশ্রী রাহা

রিম্পি ইশকুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখল—মা বাড়িতে নেই। পাশের ফ্ল্যাটের মোমাদিদি বলল, রাঙাপিসিকে নিয়ে মা গানমেলায় গেছে। ধ্যাৎ! খিদে, তেষ্টা আর গরম-লাগা মিলে ফুঁপিয়ে কান্না পেয়ে গেল।

ছোট্ট মেয়ে রিম্পি এখন কী করবে? আচ্ছা, বৈশাখ মাসের এই বিচ্ছিরি গরমে গানমেলা হয় কেন? আর ওই ভীষ্মলোচন শর্মাদের গান শুনতে... ছ্যা-ছ্যা, মা-টা না দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছেন!

জামাকাপড় পাল্টিয়ে, খুব ভালো করে হাত-পা-মুখ ধুয়ে, ইশকুলের লাইব্রেরি থেকে আনা লীলা মজুমদারের 'হলদে পাখির পালক' বইটা ব্যাগ থেকে বের করতে করতে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল রিম্পির। না, বইটা পড়ার আগে কিছু-একটা খেতে ইচ্ছে করছে!

খাবার ঘরে ঢুকে দ্যাখে কী—খাবার টেবিলের ওপর কী-একটা কাগজ নুনদানি দিয়ে চাপা দেওয়া। আরে! বইমেলা থেকে কেনা চিঠি-লেখার বাহারি কাগজে রিম্পিকে লেখা একটা চিঠি! মা-রই তো! কী লেখা আছে তাতে? ওমা! রিম্পির জন্য একটা রান্না!

রিম্পি নিজে হাতে বানাবে! জীবনে প্রথমবার!

আচ্ছা দেখি তো, মা কী কী রেখে গেছেন টেবিলে।

(১) দই : এক পেয়ালা।

(২) জল : আধ পেয়ালা।

(৩) চিনি : দু' চামচ।

(৪) নুন : এক চিমটে।

ফ্লাস্কে পাঁচটা বরফের টুকরোও রাখা আছে।

ছোট্ট চিঠিতে মা লিখেছেন, এবার নিজে নিজে বানাও।

কিন্তু গেলাস আর চামচটা?

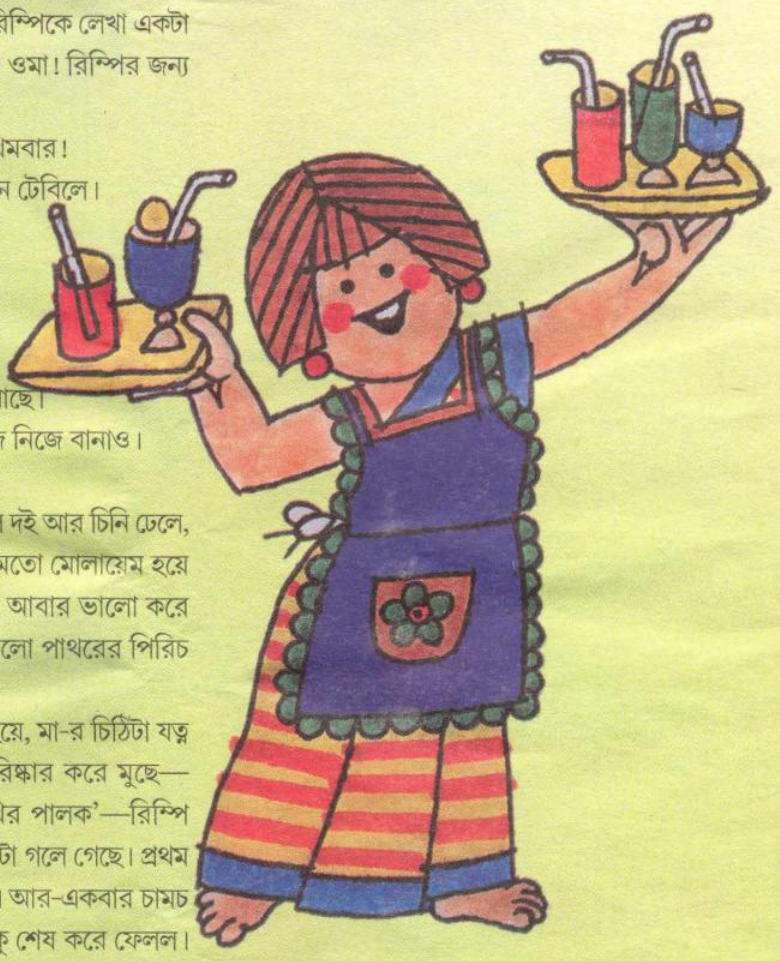

নিয়ে এসে বসল রিম্পি। কাচের গেলাসে দই আর চিনি ঢেলে, খুব ভালো করে ঘাঁটতে লাগল। মাখনের মতো মোলায়েম হয়ে গেল মিশ্রণটা। এবার জল আর নুন দিয়ে, আবার ভালো করে ঘেঁটে নিল। তারপর তাতে বরফ দিয়ে, কালো পাথরের পিরিচ চাপা দিল।

পড়ার টেবিলে বই-খাতা পরিপাটি গুছিয়ে, মা-র চিঠিটা যত্ন করে দেরাজে তুলে, খাবার টেবিলটা পরিষ্কার করে মুছে—বাঁ-হাতে ধরা, বুকে-জড়ানো 'হলদে পাখির পালক'—রিম্পি এসে চেয়ারে বসল। ততক্ষণে বরফ অনেকটা গলে গেছে। প্রথম চুমুকেই টের পেল—দিব্যি ঠাণ্ডাও হয়েছে। আর-একবার চামচ দিয়ে নেড়ে, আস্তে আস্তে গেলাসের সবটুকু শেষ করে ফেলল। কী ভালো খেতে! শরীরটাও ঠাণ্ডা হয়ে জুড়িয়ে গেল। মা কি এত ভালো পারেন? বোধহয় না।

নামাঙ্কন : সৌমিত্র সোম। অলঙ্করণ : সমীর সরকার।

পাঠকদের প্রতি

মাসে মাসে 'সন্দেশ' পেতে চাইলে তোমাদের বাড়ির কাছের পত্রিকা-স্টলে এক্ষুনি বলে দাও। নয়তো রোজ সকালে যিনি তোমাদের খবরের কাগজ দেন, তাঁকে বলো। অথবা বছরের যে-কোনও সময়ে চাঁদা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হয়ে যাও। শুধুমাত্র মানি অর্ডার-এ, কিম্বা ডাকযোগে SANDESH-এর নামে অ্যাকাউন্টপেয়ি চেক-এ চাঁদা পাঠাও 'সন্দেশ'-এর নতুন কার্যালয়ে। কলকাতার বাইরের চেক দিলে ভাঙাবার খরচ ৫০ টাকা লাগবে।

বার্ষিক চাঁদা

সব সংখ্যা হাতে নিলে ১২০ টাকা

কলকাতায় ● কুরিয়ার মারফৎ ২০০ টাকা

কলকাতার বাইরে ● শারদীয়া সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে, অন্য ১১টা সংখ্যা সাধারণ ডাকে ২০০ টাকা

কলকাতার বাইরে ● সব সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে ৪০০ টাকা

চাঁদার রসিদ দেখিয়ে মাসে মাসে হাতে 'সন্দেশ' নেওয়া যায় গ্রাহক-যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে

দক্ষিণ কলকাতায় : নেটট্রেক। ১এ মতিলাল নেহেরু রোড। কলকাতা ৭০০০২৯। 'প্রিয়া' সিনেমার ঠিক পেছনের বাড়ি

বইপাড়ায় : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। এ ১৩২-১৩৩ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। কলকাতা ৭০০০০৭

শান্তিনিকেতনে : সুবর্ণরেখার দোকান

গ্রাহকদের প্রতি

চিঠিপত্র এবং প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর আর হাত পাকাবার আসর-এর জন্য লেখা ও ছবি, ধাঁধা এবং প্রতিযোগিতার উত্তর ইত্যাদি পাঠাবার সময় গ্রাহক সংখ্যা ও বয়েস এবং নাম-ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখবে। নতুন গ্রাহকরা খেয়াল রেখো—'সন্দেশ' পাঠাবার সময় নামের বাঁ-পাশে গ্রাহক সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। যে-সব ইশকুল, ক্লাব ও লাইব্রেরি 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক, তাদের প্রতিটা ছাত্র বা সদস্যই গ্রাহক হিসেবে অংশ নিতে পারে।

লেখকদের প্রতি

লেখা পাঠাবেন 'সন্দেশ'-এর নতুন ঠিকানায়। পাণ্ডুলিপির নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে পোস্টকার্ড পাঠালে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত জানানো হবে। কার্যালয়ে ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন নেই।

এজেন্টদের প্রতি

ভারতের সর্বত্র—যেখানেই বাঙালিরা বাস করেন—'সন্দেশ'-এর **এজেন্ট চাই**। এবং বাংলাদেশের সর্বত্র। চিঠি লিখুন নতুন কার্যালয়ে। অথবা ফ্যাক্স বা ই-মেল মারফৎ জানান। নয়তো সরাসরি ফোন করুন 'সন্দেশ'-এর সার্কুলেশন বিভাগে।

সন্দেশ কার্যালয় ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড। কলকাতা ৭০০০২০

ফোন ● সম্পাদকীয় ৯৪৩৩৩৬৭৩৯৩। সার্কুলেশন ৯৪৩৩১১২৬০৭। বিজ্ঞাপন ২৪৬৩৪৭০১

ফ্যাক্স (৯১) (০৩৩) ২২২৬২৭২৮। ই-মেল sandesh1913@yahoo.co.in

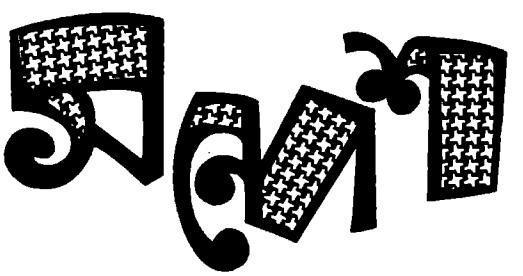

বাঙালির ছোটবেলা। চার পুরুষ ধরে।

ঘোগ

সরল দে

সকলেই ঘোগ নয়, কেউ কেউ ঘোগ—
অকারণ ঘোগভয়ে বাড়ে হৃদরোগ।
এই ভেবে বাঘরাজা ঘুমকাদা যেই
কার যেন নিঃশ্বাস তার ঘাড়েতেই!
অমনি সে গর্জালো : 'হালুলুম হুম—
কে রে তুই অবেলায় চটকালি ঘুম?'
তক্ষুনি তড়পালো সে আগন্তুক,
'জব্বর দখলেই অতি বড় সুখ।
ভেবেছিস ঘোগ নেই? এই আমি ঘোগ—
ঘোগ ছাড়া বাঘ-বাসা করবে কে ভোগ!
প্রবাদের বাক্য কি নেই জানা তোর—
উৎখাত হবি তুই অতি সত্বর।'

ঘোগভয়ে উবে যায় বাঘের দাপট
টের পায় পিঠে কার ল্যাজের ঝাপট।
কে বাঁচায়, কে কোথায় বনপাহারায়—
দূর থেকে বিপদের বার্তা কে পায়!
দ্বিপদের হাতে ফোন, ঘরে ডটকম
চার থাবা নিয়ে বাঘ কী যে অক্ষম!
ঘোগ বলে, 'আমাদের জোর খালি ফুঁ-র,
ফুঁ দিলেই উড়ে তুই—সেই আলিপুর।
সেখানেই নাম লেখা, খাতা খুললেই—
একখানা ফ্ল্যাট পাবি বিনামূল্যেই।'

বাঘ দ্যাখে চোখ খুলে কেউ কোথা নেই,
ঘোগ ছিল, ঘোগ আছে, দুঃস্বপ্নেই।

অলঙ্করণ : চণ্ডী লাহিড়ি

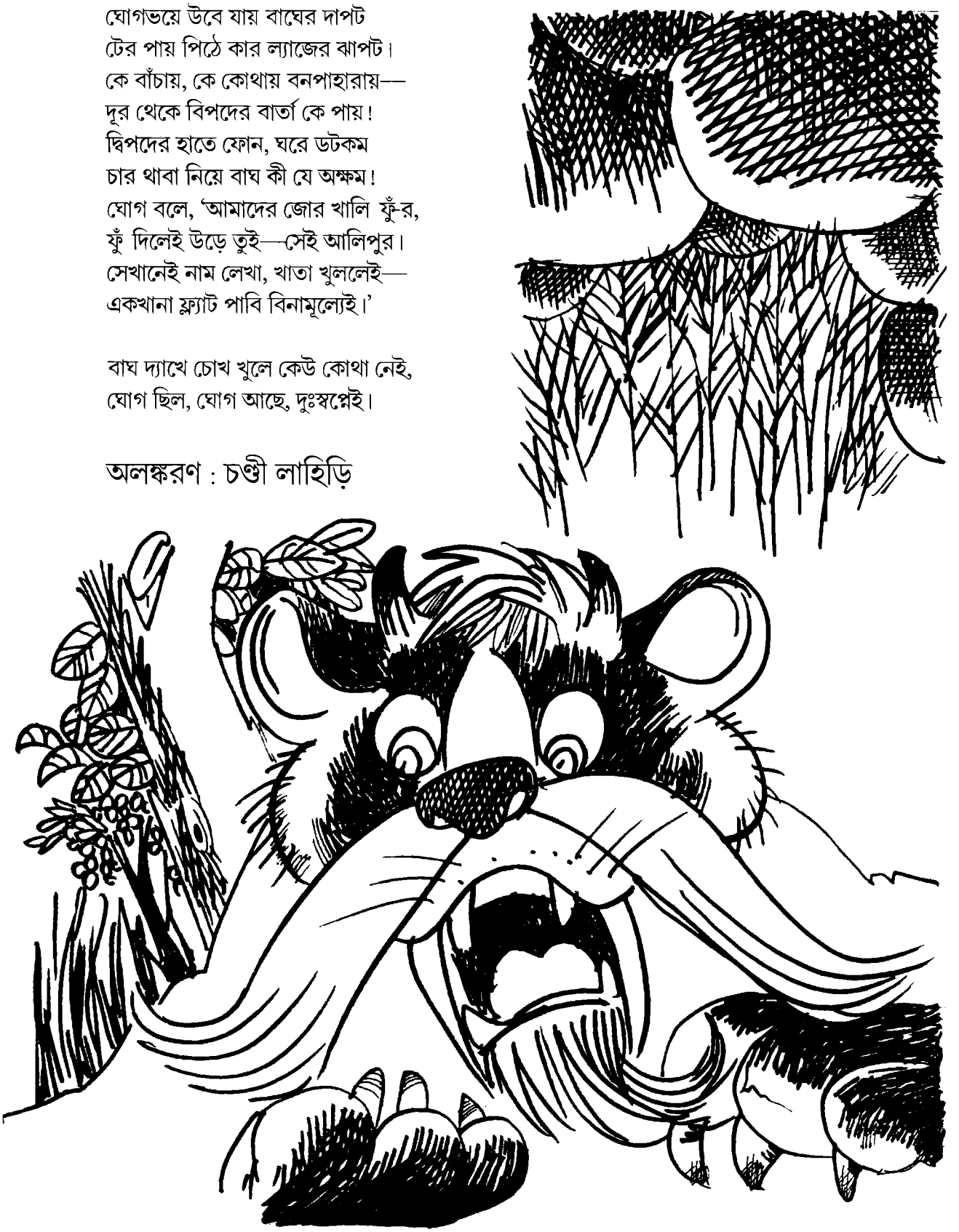

চকের হাটে ঢোলসহরৎ হল। আজ শুশুকের বিয়ে। পরান মাঝির মেয়ে রেবার সঙ্গে। বিয়ে হবে ভৈরবের চৌমোহনীর ঘাটে। যারা প্রকৃতির পড়ুয়া, তাদের সবার নেমন্তন্ন।

না-এলে দুঃখ পাব। বিশেষ এক পরিস্থিতির সামনে পড়ে শুভ বিবাহের এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তোমরা প্রত্যেকেই জানো, চৌমোহনীর ঘাটের বাৎসরিক ইজারা কত কষ্টে পরানকে জোগাড় করতে হয়।

পরান চৌমোহনীর পারাপারের মাঝি, নৌকো তার নিজের। কিশোরী রেবা হাল ধরে, পরান বৈঠা মারে। বাপে-ঝিয়ে এই ব্যবস্থা। তবে অনেক সময় বাপ একাই নৌকো টানে। মেয়ে ইশকুলে যায়। মানুষ-ব্যাপারি পারাপার ছাড়াও, চকজমার চরের ফসল ওরা পার করে।

বাইশখানা গ্রামের মানুষ কোনও-না-কোনও সময় কেউ-না-কেউ এই ঘাটে এসেই নৌকো ধরে। তাই বলে ঘাট এমন কিছু বড় নয়, নৌকোও ছোট। তবে ঘাটকে ছোট বলা হল এই জন্যে যে, এই ঘাট দিয়ে বলদ-গাড়ি কিংবা গো-মহিষ নৌকোয় পার করা যায় না। তা করতে হলে গঞ্জের সদরঘাটে যেতে হবে।

চৌমোহনী প্রধানত জমিজিরেতের চাষিবাসীর ঘাট। ফেরিঅলা, ছোট ব্যবসায়ী যায়-আসে। চার আনার পারানিতে পরানের পোষায় না। তার আসল নাফা যান্মাসিক ফসলের পাঁজায়। ধান-পাটের পাঁজা, রবিখন্দের পাঁজা। আশ্বিন-অঘ্রাণে এক দফা, আর ফাল্গুন-চৈত্রে আর-এক দফা পাঁজা আদায়ে বার হয় পরান। পাঁজা বস্তুত চাষির ফসলের হাত-তোলা। এক-হাতা পাট কী এক-হেঁটো ধান কী গম। সরষে বা ছোলাও পাঁজা পেতে পারে, তবে তা চাষি কাঠায় মেপে দেয়। হেঁটোর মাপ পাঁচ সেরি, কাঠা তিন সেরি। অর্থাৎ বেতের তৈরি হেঁটো আগে সের-এর হিসেবে বোনা হত। এখন কিলোগ্রাম হয়েছে।

গল্পটা সেরি হেঁটো-কাঠার আমলের, তখন জলে ভুটভুটি নামেনি। তখন ভৈরব নদী ছিল শুশুকের নাচের আনন্দে পাগলপারা। গ্রামের মানুষ ছিল অত্যন্ত সরল। বর্ষায় ভরা-নদী রাতদিন শুশুকের নিশ্বাসে ফোঁসফোঁস করত।

তোমরা এই ঘাট দেখেছ। এই ঘাটের মস্ত আকর্ষণ এখানকার এক প্রকাণ্ড জল-গোত্তা। অর্থাৎ, জলের ঘূর্ণি। এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ছড়ানো সেই ঘূর্ণির অলৌকিক ঘের। গোঁ-গোঁ করে ডাক দিচ্ছে ভয়াবহ ঘুরন্ত জল। জলেরই একটা ঘূর্ণায়মান স্তম্ভ সুবিপুল গোলার মতো ঘুরছে জলের নীচে সর্বক্ষণ। মনে হবে, যেন একটা বিরাটাকার প্রাকৃতিক যন্ত্র বসানো হয়েছে জলে।

ভয়াবহ ব্যাপার, কিন্তু সুন্দরও নিশ্চয়। মহাবিস্ময়কর এই ঘূর্ণির মধ্যে শুশুকেরা খেলা করতে ভালোবাসে। তাদের সেই খেলাটা শুধুমুদু খেলা তো নয়। খেলতে খেলতে ওরা একটা লড়াই চালাতে থাকে। যে-পাকে ঘুরছে জল, ওরা ঠিক তার উল্টো পাকে ঘুরতে থাকে আশ্চর্য মত্ততায়! ওরা বুদ্ধিমান, তাই ওরা অসংখ্য কাছিমকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। এই-যে ঘোরাঘুরি, সেটাই আসল গল্প। ওরা যদি ওইভাবে না-ঘুরত আর কাছিমদের না-ঘোরাতো, তাহলে মানুষের বিপদ হত। ওরাই শিশাডিহা-চকজমার ঘর-বসত, জমিজমা এবং জনমানুষ আর ঘরপালা-পশুদের টিকিয়ে রেখেছে। নদীর ভাঙন ঠেকিয়ে রেখেছে ওরাই। কিন্তু কীভাবে—সেটাই আর-একটু খোলসা করে বলি।

নদীটাকে আগে লক্ষ্য করো। নদীর একটা বড় বাঁক এই চৌমোহনী। বাঁক নেওয়ার ফলেই স্রোত এসে এক পাড়ে ধাক্কা খেয়ে বিপরীত পাড়ে গিয়ে পড়ছে। এবং সেখানে রামধাক্কা খেয়ে উল্টো পাড়ে সামাল নিতে গিয়ে ঘুরতে শুরু করছে। এই গোত্তায় পড়লে, যা পড়বে, তাকেই ঘোরাতে থাকবে ঘূর্ণি। কিছুতেই গোত্তায় পড়া নৌকো বা মানুষ বা পশু জল পেরিয়ে কোথাও যেতে পারবে না—কেবলই ঘুরতে থাকবে। গোত্তার আওতা থেকে নিস্তার পাওয়া অত্যন্ত মুশকিল। পাওয়া যে না-যায়, তা নয়, তবে ভীষণই কষ্টে। কে বা কারা কী করে কতক্ষণে নিস্তার পেয়েছিল, তা নিয়ে নানান গল্প আছে এই অঞ্চলে।

ধীমান আর কিরণমালা অনেক গল্প শুনেছে রেবার মুখে। রেবাকে সেই গল্প বলেছে ওর বাবা পরান মাঝি। তাছাড়া রেবা নিজেও দেখেছে নানান ঘটনা। রেবা জানে, কীসে থেকে কী হয়।

উজান থেকে ভাটির দেশে ফিরছিল বর-কনে বিয়ের পর। উজানে যেতে বৈঠা মারতে হয়, ভাটিতে যেতে বৈঠা লাগে না, খালি হালেই গন্তব্য সহজ। নৌকো যখন বিয়ে নিয়ে ফিরছে, তখন বৈঠায় মাঝি নেই। হাল ধরে একা বসেছিল ছিরুপতি হালদার। এবং নৌকোর ছইয়ের মধ্যে পাঁচজন প্রাণী। কমবয়েসি বর-কনে ছাড়া বাড়তি দুই স্ত্রীলোক। তাদের একজন মধ্যবয়স্কা মাতৃস্থানীয়া কেউ, বরের শ্বশুরবাড়ির তরফের। এবং এক কিশোরী, সম্ভবত বরের শ্যালিকা। গোত্তায় এসে পড়ল বিয়ের তরণী। মাঝি ছাড়াও ওই নৌকোয় আরও একজন পুরুষ রয়েছে।

নৌকো গোত্তায় পড়ার আগেই গোত্তায় পড়ে ঘুরে মরছে একটি গুম খুনের লাশ এবং একটি মৃত গরুর কঙ্কাল। তাদের সঙ্গে যুক্ত হল নৌকো। শিশাডিহার লোকেরা অনেকে পাড়ে দাঁড়িয়ে নাকে কাপড় চেপে হাহাকার করে উঠল।

গোত্তার আওতার বাইরে ঘূর্ণির গা-ঘেঁষেই পরানের পারের নৌকো যায়-আসে। পারাপারের যাত্রীরা বিয়ের নৌকোর গোত্তায় পড়ে যাওয়া দেখে চেঁচাতে লাগল। ছিরুপতির মুখ শুকিয়ে গেল হাল মারতে মারতে। কিছুতেই বেচারি নৌকোকে গোত্তার প্রবল টানের বাইরে হাল মেরে ঠেলে দিতে পারছে না। গলদঘর্ম হয়ে গেছে ছিরু। হাঁপাচ্ছে আর নিশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে, কপালের ভাঁজে ঘাম জমেছে, গলার ধুকধুকি ধকধক করছে।

কোঁচ

আবুল বাশার

অলঙ্করণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ছিরুপতি ভয়ে একটু একটু করে ভগবানকে ডাকতে শুরু করল। তাই দেখে বর-কনে এবং নৌকোর অন্যরা সিঁটিয়ে গেল। ছইয়ের ভেতরের মেয়েরা একসময় কান্নাকাটি শুরু করে দিল। নতুন বউ কাঁদলে কারই-বা ভালো লাগে!

দেখতে দেখতে সময় বয়ে যেতে লাগল। নদীর বুকে দক্ষিণের হাওয়া বয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর জল গরম দুধের মতো ফেঁপে উঠতে লাগল। নদী যেন ফুঁসে উঠে নাচতে লাগল। পরান যাত্রী নিয়ে নৌকা ভিড়িয়ে দিয়েছে চৌমোহনীর দক্ষিণ ঘাটে। সেখানে ছুটে এলো শিশাডিহার লোকজন।

শোনা গেল, শিশাডিহায় পাড় ভাঙতে শুরু করেছে। নদীর বুকে কোথাও শুশুক দেখা যাচ্ছে না। মানুষ জানে, শুশুকরাই পাড় ভাঙার বিপদ থেকে শিশাডিহাকে রক্ষা করে, গোত্তার তাণ্ডব সামাল দেয়। অবশ্য মানুষ জানে বলাটা ঠিক হল না। গোত্তা শান্ত হয় কী করে, তারা জানতই না। পরানই তাদের বলেছে। সে-কথা এখনও সব লোকে বিশ্বাস করেনি। যারা করেছে, তারা শিশাডিহায় নিতান্তই সংখ্যালঘু।

আজ কিন্তু ভয়ে আর বিস্ময়ে চক-শিশার লোকেরা দিশেহারার মতো পরানের কাছেই ছুটে এলো। মসজিদের ইমাম বরকত মিঞা যেমন ছুটে এসেছেন, ইশকুলের মাস্টারমশাই সনাতন মুকুটিও এসেছেন। তখনকার সময়ের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট তারাদাস সিকদারও এসেছেন। তাঁরা সবাই জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার, বলো তো পরান!'

পরান বলল, 'পঞ্চপাণ্ডব ঘাপটি মেরেছে বাবু।'

'পঞ্চপাণ্ডব!' অবাক হলেন সনাতনমাস্টার।

ISO-9001-2000

EPOCH Electronica Ltd.

Pocket Friendly Power Solution

Welcome

to the ever-increased family of satisfied line interactive UPS.

SALIENT FEATURES OF EPOCH LINE INTERACTIVE UPS SYSTEM

- Line interactive topology with full range AVR
- Latest PWM MOSFET Technology
- Very high efficiency
- Full time spike/surge and EMI control
- Overload and Short Circuit protection
- Sleek and Compact size

Epoch Electronica Ltd.
Corporate Office
66,Salkia School Road,Howrah 711106.West Bengal. India.
Phone: 2665-9193/9123/1551,E-mail: eel@cal.vsnl.net.in
www.epochelectronics.com

metrek 04-05

পরান ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'আজ্ঞে। নদীতে শিশুক অনেক। কিন্তু চৌমোহনীর ঘাটে ওরা পাঁচভাই মিলে গোত্তার পানিমহল কন্ট্রোল করে। যতেক কাছিম, সবাইকে চালায়। জলের ভেতরে সেই খেলাটা আমি দেখেছি প্রেসিডেন্টবাবু।'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'সে কী হে!'

পরান হালকা করে হেসে নিয়ে বলল, 'নদীর খবর চব্বিশ ঘণ্টা জলে না-থাকলে কেমন করে জানবেন, বাবু! সেই ছেলেবেলা থেকে জলেই তো ডিউটি দিচ্ছি ইমামসাহেব। একবেলা কামাই দেওয়ার উপায় নেই। রাত বারোটা পর্যন্ত ধানপান-প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে। ওদিকে ভোররাত চারটে নাগাদ ব্যাপারি এসে পড়ে। কখন ঘুমাই আর কখন খাই, বলেন তো মাস্টার ?'

সনাতন বললেন, 'পঞ্চপাণ্ডব বুঝলে কী করে পরান ?'

'বুঝব না! মহাভারতে লেখা পড়েছে বাবু।' বলে বুক ফুলিয়ে একটা হৃষ্ট ভঙ্গি করে পরান।

বিপদের সময়েও সনাতন একপ্রস্থ হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'আহা, সে-কথা নয়। বলছি, শুশুকরা যে পাঁচ ভাই, বুঝলে কী করে ?'

'চোখের মাপে ঠাউরেছি মাস্টার। ওই চরে ওরা মাকে সঙ্গে করে খুব ভোরে রোদ পোয়াতে জল থেকে উঠে গা এলিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষের অভিসন্ধি খুব খারাপ। কোঁচঅলারা ঘুরছে, তেলঅলারাও নজর দিয়েছে প্রেসিডেন্টবাবু। পানিমহলে ফরিস্তা পর্যন্ত ডরিয়ে গিয়েছে বাবা। বাইশি-বিচারে সে-কথা হয়েছে মাস্টার।'

এই বলে আকাশে চেয়ে থ হয়ে রইল পরান। ওর চোখে জল। বেচারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কচ্ছপের ডিম একটাও রক্ষা পাচ্ছে না। হয় শকুনে খায়, নয়তো মানুষে নেয়। আর ভেবে দেখেন বাবুসাহেব, কাছিমরাই তো জলের তলার সৈন্য। এদের চালাচ্ছে পাঁচ ভাই মিলে। দোনাচায্য কে ? ওই শিশুক। জলের মহাভারত সামান্য জিনিস নয় বাবা!'

'ভালো বলেছ তো!' সনাতন গাঢ় বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তিত দেখায় তাঁকে। পাড় যেভাবে হুড়মুড় করে ভাঙতে শুরু করেছে, শিশাড়িহা উৎসন্নে যাবে জলের গরাসে। মহা অকাট্য ভয় মানুষকে ধীরে ধীরে চেপে ধরতে থাকে। বিয়ের নৌকো ঘুরছে তো ঘুরছে। গান দেওয়া বিয়ের মাইক নৌকোর মাথায় রেকর্ডের চাকতিতে পিন আটকে কেবলই ঘষটাচ্ছে পৌনে এক ঘণ্টা যাবত।

'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে' গানটাই যেন জলের ফান্দায় আটক পড়ে কঁকাচ্ছে। নববধূর চোখের জলে কাজল ধুয়ে যাচ্ছে। মাতৃস্থানীয়া কাঁদছেন, কিশোরী ফোঁপাচ্ছে, বরের চোখে ভীষণ আতঙ্ক। ছইয়ের প্রৌঢ় ব্যক্তিটি কেবল চুপ। ছিরুপতি হাল ছেড়ে দিয়ে দু'-হাতে মুখ ঢাকল।

বর-কনের বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন দল-বেঁধে হাহাকার করতে করতে ছুটে এলো ঘাটে। এই নদীতে মাঝে দু'-একবার কুমির দেখা দিয়েছে বলে লোকে আজকাল ঘাটে চান করতেও ভয় পাচ্ছে। আসলে ভৈরব মাছ আর শুশুক এবং কচ্ছপের নদী। এতে কুমির আসাটা বিরল ঘটনা। এখন নদী ভয়ংকর ফুঁসে উঠেছে বাতাসের তাড়নায়।

মানুষের এবং ভাগাড়-পচা গরুর লাশে চৌমোহনী ক্রমশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে, পাড় ভেঙে দু'খানা ঘর তলিয়ে গেল। ইমাম মসজিদে ছুটে গিয়ে ত্রস্ত গলায় আজান হাঁকতে শুরু করলেন—চারিদিকে শঙ্খধ্বনি দিতে শুরু করল মেয়েরা। ঘূর্ণন কিন্তু থামল না।

পরান কেবলই ভাবছিল—শুশুকরা সব গেল কোথায়! হঠাৎ মনে হল, ওরা এখানে নেই। ওরা নেই মানে কচ্ছপরাও পালিয়েছে। দূষণ বাড়বে, পাড় ভাঙবে, মানুষ মরবে।

মানুষের লাশ আর গো-কঙ্কালের দুর্গন্ধে শিশাড়িহা হেজে যাবে। যখন গুম-খুনের লাশ ভেসে এসে এই গোত্তার গ্রন্থি বা জলের গিঁটে আটক পড়ে, তখন খর-চোখে নজর দিলে মালুম হবে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়ে দিচ্ছে কাছিম আর শুশুকে।

রেবাকে এই জিনিস দেখিয়ে দিয়েছে পরান।

'ওই দ্যাখ, কাছিমে শিশুক-এ উল্টা করে চরকি পাক শুরু করল। দৃষ্টি কর, জলের তলে তোলপাড় হয়, নজরে রাখো ঘটনা। ক্রমে ক্রমে উপরের জল ঢিলে দেবে, নরম হবে গোত্তার জলসুতো। আর তখনই লাশ বেরিয়ে যাবে সুড়ুৎ করে সাবানের মতো! একটা বড় কাজ করছে ওরা, কাউকে না-দেখিয়ে। ইমামে কয়, জলে ফরিস্তা নিবাস করে। ধরা যাক করে। তাহলে এত বড় কাজটার সাক্ষী তেনারাই। ফরিস্তা মানে জানিস তো রেবা, জলের দেবদূত—হয়তো আছে কিংবা নেই। ধরা যাক আছে, তাই না ?'

'তুমি ওইসব বিশ্বাস করো বাবা।'

'শিশুক আর কাছিম তো শুধু কোনও বিশ্বাসের ব্যাপার নয় খুকি, তাদের কাজও সত্যি মানুষ সে-সব দেখে না বলেই, ফরিস্তা দেখছে ভাবলে আনন্দ। এই-যে শিশুকরা, এরা যে পঞ্চপাণ্ডব, এদের ভালো করে চকশিলার লোকে দেখেইনি কখনও। তাই বিশ্বাস করতে চায় না। ভাবে গল্পগাছা হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'কাছিম নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি রেবা। শিশুক নিয়ে দেখি। কেননা বাবা বলেছিলেন, সমুদ্রের তলে নাকি ঝড় আর ভূমিকম্প হয়। তখন জল খাড়া হয়ে তেড়ে আসে মানুষের দিকে,

ঘর-বসত ভাসিয়ে দেয়। সমুদ্রের ঝড় ঠেকায় কে ? ওই কাছিমে। কাছিমের গড়ন একটা আশ্চর্য জিনিস।'

'হ্যাঁ।'

'অমন চেটালো আর শক্ত খোল সাধে কি হয়েছে ?'

'কেন হয়েছে ?'

'জলের তলে লড়তে হয় বলেই তো হয়েছে। জলের তেজ সামলাতে খোলটাই তো ঢাল। একটা কাছিম আড়াইশো-তিনশো বছর বেঁচে থাকে জলের সঙ্গে লড়বে বলে। শিশুক শৌখিন জীব। কাছিম কিন্তু মেহনতি। বুঝলে এখন ?'

'হ্যাঁ বাবা, বুঝেছি। কাছিমের ওইরকম আকার না-হলে চলে না।'

'কেন চলবে! প্রত্যেক আকারের তো মানে আছে। যার যেমন তার তেমন। যেমন ধর, গাছপালার মুড়ো চিবিয়ে বাঁচতে হলে লম্বা গলা দরকার। তাই জিরাপের গলা অত দিঘল। এই না ? তাছাড়া উটের কথাই ধর, ওর আছে জল স্টক রাখার থলি। কারণ, মরুভূমির জীব বলে জলের স্টক লাগে। মরুভূমিতে জল তো সবখানে মেলে না, তাই সঞ্চয় করে রাখা। অনেক পথ চলতে হয় উটকে নিরম্বু। তাই আমার প্রত্যেকটা আকার সহি মনে হয়। যা সহি, তাকে সুন্দর বলাই ঠিক। কাছিম সুন্দর। কারণ, সে কাজ দেয়। বাবা-ঠাকুদ্দা বলে গেছেন, আকারটা-প্রকারটা চেহারা-ছবি কাজে-কাজেই কিনা বুঝতে হবে।'

'বইতেও লেখে কাছিমের গল্প। উটের কথা।'

'লেখে বইকি। তা ধর, দুনিয়াটাই তো বই। তা-বলে ভেবো না, ইশকুলে তোকে ইতি দিতে বলছি। সেটাও থাক, এটাও থাক। ঠিক করেছি, কাছিম আমি মারতে দেব না। শিশুক-সংহার হলে বিপদ। নদীর সঙ্গে তালে তালে নাচবে কে বল তো! ওর নাচ তো অন্যে পারবে না।'

'বাবা!'

'হ্যাঁ, বল।'

'শুশুকের তেলে বাত সারে ?'

বাপ এবার চুপ। মেয়ে অপেক্ষা করে বাপ কী জবাব দেয়। পরানের বাতের অসুখ। জাফরান তেলে সারেনি। বৈঠা ঠেলে, হাল মেরে, জলে নিবাস করে তাকে বাতের ব্যামোয় ধরেছে। কোমর, হাত-পা কনকন করে। গাঁটগুলোয় জং ধরার মতো অবস্থা। অনেক সময় পাড়ে নৌকো বেঁধে উঠে দাঁড়িয়ে ডাঙায় লাফ দিতে গিয়ে হড়কে পড়ে যায় পরান মাঝি। একবার পাড়ের কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল।

বাবা যখন আচমকা লাফ দিয়েই থুবড়ে পড়ল, রেবার ভারী দুঃখ হল। বাপের কষ্ট মেয়ের বড্ড বেশি লাগে। নৌকো থেকে তাড়াতাড়ি নেমে কাদামাখা বাবাকে রেবা খাড়া করল। তারপর বলল, 'তুমি নাদান হেকিমের চিকিচ্ছে নিচ্ছ না কেন বাবা!'

পরান কথা না-বলে নদীর জলে নেমে গেল। গলা অবদি চান করে কাদা ধুয়ে ফেলল। রেবা জানে, তার বাপ নাইন ফেল হলেও মূর্খ নয়। নৌকোয় বৈঠা ঠেলে কাঁহাতক ভালো পাশ দেওয়া যায়। পড়ায় মন আর টাইম দুই-ই লাগে। বাপ সেটা দিতে না-পেরেই তো নাইনে ফেল হয়ে পড়া ছেড়ে, সর্বক্ষণের মাঝি হয়ে যায় সেই কবে। ফেল হলেই বাবাদের আমলে ছেলেরা বিয়েশাদি করে পিতৃপেশায় কাঁধ দিয়ে ব্যর্থতা ভোলার চেষ্টা করত।

কিন্তু সবাই কি আর সেই বিফলতা মন থেকে তাড়াতে পারে? বিয়েশাদি-ঘরসংসারে কি পড়াশোনার আকাঙ্খার স্বাদ মেটে ? সবার মেটে না।

সেই স্বাদ মানুষ পরবর্তীকালে সন্তানের সফলতা দিয়ে মেটাতে চায়। রেবাই পরানের একমাত্র সন্তান। তাই রেবাকেই বড় পাশ দেওয়াতে চায় পরান মাঝি। নৌকোয় হাল ধরে বিদ্যা নষ্ট করার দরকার নেই। কিন্তু বান-বর্ষায় হাল না-ধরে পারে কী করে! বাপের তো ছেলেপুলে নেই। তাছাড়া নৌকো বাইতে রেবা আনন্দ পায়।

বর্ষা-বানে এই নদীকে দেখায় পারাবারের মতো মস্ত। কী ভয়ংকর সুন্দর দেখায়! তখন বৈঠা না-মেরে খালি হালে নৌকো পারে নেওয়া যায় না। ঢেউয়ের সঙ্গে নৌকোর বিবাদ সামলাতে হলে হাল-বৈঠা দুই-ই লাগে।

খুব বাচ্চাকালেই জেদি রেবা হালে হাত দেয়। বাপের মানা শোনেনি। জোর করে হালের বিদ্যা শিখে নিয়েছে। এই নৌকোর আকার-প্রকার কী চমৎকার, খাশা একটা ব্যাপার। এর দুলুনি কী বিস্ময়কর! এর ছন্দ কী মোহময়! ঢেউয়ের নৌকোর নাচন রক্তে দোল লাগিয়ে রেবাকে পাগল করে তুলত সেই শৈশবে।

রেবা এই নৌকোতেই জন্মেছে। বাসন্তী ভৈরবে চৈতালি গন্ধে, ফলে-পুষ্পে-ফসলে আর ছন্দে-তালে-নৃত্যে-গানে তার জন্ম। সে যখন জন্ম নিচ্ছে, তখন ওই শুশুক ওরফে শিশুক ওরফে শিশুমার ওরফে ডলফিন জলে নাচ আর গান দিয়েছিল। জলের ঢেউয়ের তাড়নায় লাফিয়ে উঠে ডান্স দিতে দিতে শিশুমার দেখেছিল সদ্যোজাত শিশুর রক্তিম মুখটুকুনই। সেই ফাল্গুনি নদী তখন মন্থর এবং স্বচ্ছ, এই চৌমোহনীতে জলগোত্তা নিতান্ত শিথিল এবং উদাসীন—যেন তার কোনও কাজ নেই। এই অবস্থায় শিশুমার লাফায় কম, নাচেও অল্প, গান করে সামান্য। তবু সেই নাচ-গান-নৃত্য শিশুর পক্ষে কম ছিল না। রেবার রক্তের দোলা কখনও থামেনি।

বান-বর্ষার সময়েই পাড় ভাঙতে শুরু করে। যদিও তখন রেবার রক্তের দোলা চলতেই থাকে। নদীকে দেখায় মস্ত পারাবার আর ডলফিনের নাচন বাড়ে, মত্ততা বেড়ে যায়। জলের ওই ঘূর্ণি হয়ে ওঠে ভয়াবহ। শরৎকালের মাঝামাঝি নদীর বেগ

অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে—তখন জলের গোত্তা খানিকটা নরম হয়, তার উচ্চন্ড উগ্রভাব থাকে না। তবু ওই গোত্তায় পড়লে, ছোট নৌকো বেতালা হয়ে ঘুরতে থাকে। যদিও হাল মেরে, বৈঠা টেনে উদ্ধার পাওয়া যায় কোনও মতে। একা একজন মাঝি শুধুমাত্র হাল ঠেলে গোত্তার আটক থেকে বার হতে যথেষ্ট বেগ পায়। কখনও বা পারেও না পরান সাহায্য না করলে।

বর্ষার শেষাশেষি এই ভাদ্রে নতুন ভাদ্রবউ নৌকোয় বসে জলের কয়েদি হয়ে গেল। এইসময় ভাদুই ধান ওঠে, ষাটি ধান হয়। ধানের নানান ব্যাখান বাবার কাছ থেকে জেনে গিয়েছে রেবা। ষাটি হল ষাটদিনের ধান। মাত্র দু' মাস সময় দিলেই ধানবীজ চারা থেকে ঝাড়ালো হয়ে শীষ নেয় এবং পেকে ওঠে।

ছেলের বিয়ে দেবেন বলে হিফাজত মিঞা চার বিঘা ষাটি ধান করেন এ-বছর। চাষি কখনও ষাটি অধিক করেন না। কারণ, ষাটির ফলন কম। হিফাজত চার বিঘা করেছেন বিয়ের জন্য।

লোকে এখন চৌমোহনীর ঘাটে হিফাজত মিঞাকে নানান কথায় দুষছে। বলছে, 'অত তাড়া কীসের ছিল ? ভাদ্রবউ করতে গেলে কেন! আঘনিবউ করলেই তো পারতে। আমনবউ তো আর ফেলনা হয় না, সবাই তো আমনেই বউ আনে ঘরে।'

একজন বলল, 'সে কোনও কথা নয়। কারও তাড়া থাকলে, ষাটি বুনে বিয়ের খানাপিনা দিবে। বেতাই কী নোনা, নাইবা তাকাল সেদিকে। কে কোন মাসে শাদি বসাবে, সে তার মর্জি। হিফাজত মোটা বরপণ নিয়ে, সোনাদানায় সাজিয়ে বউ পেল বলেই-না এই তাড়া। পাছে কন্যে হাতছাড়া হয়, তাই।'

আর-একজন বলে উঠল, 'তা না-হয় হল। কিন্তু এখন ল্যাঠা সামলায় কে ?

তৃতীয় একজন বলল, 'থলপথে না-গিয়ে পানিপথে কেন বাবা!'

ঘাটে নৌকো এখন জলখুঁটায় বাঁধা। ওইদিকে পাড় ভেঙে চলেছে। এদিকে পারাপার বন্ধ। ভাদ্র মাসের গোড়ায় হিফাজত এ কী করলেন!

সবই শুনছিল পরান। রেবা বাপের মুখপানে চাইছিল মাঝে মাঝে। সে ভালোই জানে, সব ধান একরকম নয়, সব বিয়েও এক নয়। অনেক গেরস্ত এই দিগরে ধানের উপর নয়, পাটের উপর বিয়ে বসায়। বসানো অর্থে আয়োজন বুঝতে হবে। ষাটি এক আশ্চর্য বীজ, সে-কথাও জানা চাই। বীজের জল আছে, মাটি আছে।

বেতাই জলে ফলবতী, ষাটি স্থলে। নোনা ধান বানের জলেও বাঁচে। ষাটি নদীতে বা খালে-বিলে হওয়ার নয়। বেতাই-এর পুষ্টি নদী-খালবিলের কিনারে ও মাঝে। নদীজল বাড়লে বেতাই বন্যার সঙ্গে লড়ে বেঁচে থাকে। এবং বৃদ্ধি পায়। ভৈরবের চরে বেতাই-নোনার চাষ, ওই দিকের এক ছোটনদীতে বেতাই লকলক করছে।

অতএব বোঝা যাচ্ছে, ষাটি ধানের এই বিয়েতে আসল লক্ষ্য বরপন। আঘনি বা আমনবউ অর্থাৎ অগ্রহায়ণের আমন ধানে বিয়ের বউ হলে, গোত্তায় নৌকো কয়েদ হত না।

আষাঢ়-শ্রাবণ টানের মাস। অর্থাৎ, চাষির ঘরে অনটন থাকে। এই অনটন সামাল দেয় ষাটি। ষাটিকে ভাদুই ধান বলা যায় না, আমন তো নয়ই। ষাটি প্রাক-ভাদুই স্পেশাল ধান।

ভাদ্রের একেবারে গোড়ায় অথবা শ্রাবণে ষাটি ওঠে। এই সময় গত সনের আমন যা গোলায় ছিল, সব খেয়ে ফুরিয়ে গেছে। আগের ভাদ্রধান কবেই গেছে। সংসার খালি হয়ে পড়েছে। তখনই ষাটির গল্পটা শুরু হল।

পরানের দু'-হাত দু'-হাতে জড়িয়ে প্রায় কেঁদে পড়লেন হিফাজত। বললেন, 'ভাই পরান, বিয়ের নাওখানা গোত্তা পার করে দাও। তোমাকে আমি ষাটির এক বস্তা পাঁজা দিব। তোমার মেয়ের বেলায় আমি তো আছি। পাটে-আমনে হলে তাই নিও। রবিখন্দে হলে, তাই সহি। খালি জানিও, কবে বিয়ে দিচ্ছ।'

এই সময় রেবা শিউরে আর্তনাদ করে উঠল, 'বাবা! কোঁচ!'

কোঁচকে বাপ-মেয়ে অতিশয় ভয় করে। কোঁচ হাতে একদল শিশাডিহার লোক। সরু তলতা বাঁশের ডগায় বর্শা-ফলক লাগানো কোঁচে, মাছ এবং কাছিম ধরে ওরা। ছররা বর্শা। ওরাই শক্ত জালে আটকাবার আগে শুশুককে কোঁচে গাঁথার চেষ্টা করে। সরিষাবাদের নাদান হেকিমের কাছে ওরা নদীর শুশুক বেচে দিচ্ছে। ওরা শুশুক ধরার জাল বানিয়েছে—ওইদিকে ভৈরব আর ছোটনদী গোমানির সংযোগস্থলে মস্ত 'খাটান' ফেলেছে জালের। এরা আসলে মাছ নয়, কাছিম আর শুশুক ধরার দল।

শুশুক ঝলসে তেল বানিয়ে নাদান হেকিম আর খগেন ওঝা ব্যবসা ধরেছে। একদিন পরানের সঙ্গে খগেনের তুমুল বচসা হয়েছে এই ঘাটে। নাদানের সঙ্গে রা পর্যন্ত কাড়ে না পরান। একবার চরে ধান আনতে চলে গেছে নাদানকে ঘাটে দাঁড় করিয়ে রেখে।

আষাঢ়-শাওন সংসার ভালো যায় না পরানের। ষাটির পাঁজা মানুষ তো দেয় না, গেরস্ত চাষি নিজেই খায়। চাল এইসময় বাজারে আক্রা যায়। সংসার বেশিরভাগ দিন আটায় চলে। তখন বুকটা ভাতের জন্য কেমন খাঁ-খাঁ করে। সাতদিন অন্ন হল না, এমন সপ্তা-হপ্তা এই টানের সময় মাস-দুই দেখতে হয় মাঝিকে। নদীতে মাছ ভর্তি, জালগুলো মাছে ছয়লাপ। এদিকে মরাই শূন্য, উঠেছে কেবল ষাটি।

কথায় বলে, মাছে-ভাতে বাঙালি। কিন্তু মাছ আছে, ভাত নেই—এমন অনটন সবাই কি বোঝে ? ষাটি ধানের খেয়া তো দিতেই হয় পরানকে, কিন্তু পাঁজা তো পায় না।

কোঁচঅলারা শিশুক কাছিমের দুশমন, এদের পরান ঘৃণা করে। নৌকোয় নিতে চায় না। নানান অজুহাত তুলে চরের দিকে চলে যায়।

তাই নিয়ে পরানের নামে বাইশি-বিচার হয়ে গেছে গত সন। বাইশ গ্রামের মানুষ জড়ো হয়েছিল। মুরুব্বি-মোড়লরা কোঁচঅলাদের নৌকোয় পারে নিতে চাপ দিয়েছে। পরান নিমরাজি হয়েছে। তার চোখে জল এসে পড়েছিল।

'বাবা, কোঁচ!' ফের বলে উঠল রেবা। এবং ডুকরে উঠল, 'ওরা কাঁধে মোটা জাল নিয়েছে দ্যাখো। নাদানের লোক। এখনও বুনে শেষ করেনি।' হিফাজত রেবার কথা শেষ হতে দেন না। বলেন, 'আটক নাও, খালাস কর পরান। এক মন ষাটি পাবে, এই জুবান সাচ্চা জুবান মাঝি। তরাও মোকে। খোদা কসম, দিব। না-দিলে মুখে কুষ্ঠ ধরবে ভাই।'

গলুইতে বসে রয়েছে পরান। বসে থাকতে থাকতেই পায়ে বাত চাগাড় দেয়।

পরান বলল, 'নাও খালাস হবে কী করে হিফাজতদা, ওই নাওতে নাদান হেকিম রয়েছে। ওকে জলে নেমে যেতে হবে। ওর কাছে শিশুকের তেল আছে প্রেসিডেন্টসাহেব। সেই গন্ধে শিশুকরা জলের মধ্যে ঘাপটি মেরেছে। তাই দেখে কাছিমরা নড়ছে না। এই ঘাট নিলামে ডেকে ইজারা নিই। ঘাট পি ডব্লু ডি-র, ইজারা আমার। আসলে ওই গোত্তার পাকসাটা শাসনে রাখে পঞ্চপাণ্ডব। আমি নদীর মানুষ, পারানি-পাঁজার জীব। আমার কী সাধ্য বাবাসকল! কিচ্ছু না।'

'কিচ্ছু না ব'লো না ভাই। তুমিই সব, তোমারই তো ঘাট।' বলে নৌকোর খোলে উবু হয়ে বসে পড়েন হিফাজত।

খোলের মধ্যবর্তী মাচার দুই প্রান্ত ফাঁক রেখেছে মাঝি। নৌকোয় জল উঠলে ডই দিয়ে তুলে যাতে ফেলে দিতে পারে। ওই ফাঁক গলে উবু হয়েছেন হিফাজত মিঞা। ওঁর পরনের পশ্চাৎ অল্প জলের গড়ানিতে ভিজে যাচ্ছে, তাই দেখে অনেকে হাসছে। মানুষ কাউকে আছাড় খেতে দেখলে যেমন হাসে, তেমনই ওই পশ্চাৎ ভিজলেও হাসে। মানুষ অদ্ভুত জীব।

পরান বলল, 'ইজারা তো পার্মানেন্ট দলিল নয় দাদা। নৌকো আমার। তাই মনে হয়, ঢেউ আমার। জলের নাচন আমার। নৌকো দুলছে ঢেউয়ে। ভাবি, নাচের দোলা আলবৎ আমারই। ঢেউ না-চিনলে, নাও পারে নিতে পারব না।'

'সাচ্চা বলেছ পরান। এক মণ ষাটি তুমি পাচ্ছ। আমি প্রাইমারির মাস্টার, আমার আবাদ আছে, বিবাদ নাই। কথা দিলে রাখি। কথা দিলাম।' বললেন হিফাজত।

রেবা নিচু গলুইয়ের পাটাতনে পড়ার বই কোলে নিয়ে বসে রয়েছে। ফের বলল, 'বাবা! কোঁচ!'

পরান আকাশে চোখ তুলে মেয়ের আর্তস্বর হজম করল। আকাশে এই বিকেলে কাটা কাটা মেঘ আর ফ্যাকাশে নীল দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমে মেঘ ফেড়ে শিশে রঙের সূর্যকিরণ নদীজলে রুপোর মতো জ্বলছে।

হিফাজত অমন পশ্চাৎ ভিজিয়ে খোলে উবু হয়ে বসতে পারেন, কল্পনাও করেনি পরান। এই মানুষই তো বাইশি-বিচারে পরানের উপর অসম্ভব তড়পেছেন। গত সনে ওই নাদানের অপমান হচ্ছে বলে পরানকে নাকখৎ পর্যন্ত করিয়েছেন এই ঘোড়েল মানুষটা। কোঁচঅলারা ওই হিফাজতের আশকারা পেয়ে কোঁচ হাতে করে তেড়ে এসেছিল। পাঁজা বন্ধ করে দেবেন বলে শাসিয়েছেন ইনিই। 'ইনি' মানুষটা ভালো নয়, রেবাও জানে।

রেবা বাবার অপমানে কষ্ট পেয়েছে। ওই বাইশি-বিচার মজলিসে প্রকৃতি-পড়ুয়ারাও ছিল। ধীমান, কিরণমালা ছিল। রেবাকে কাঁদতে দেখেছে তারা।

হিফাজত যে নাদানের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করবেন, তখনই বোঝা গিয়েছিল। নাদান আসলে নিদান শেখ, হেকিমি করেন এবং সম্পন্ন গেরস্ত। মেয়েকে বিয়ের পর নিজেই নৌকো করে পৌঁছে দিতে চলেছেন শ্বশুরঘর। শুশুকের তেল বেচে পয়সা করেছেন। বিচার-মজলিসেই বলে উঠলেন, 'শিশুকের তেলে পরানের আপত্তি কীসের—শুধিয়ে নেন হিফাজত মিঞা। বলি কী, তেলের মালিশ নাও পরান। না-নিলে নৌকো ঠেলতে পারবে না। আমি নাকখতের পক্ষে বলি না, তেলের পক্ষে বলি। আমি ধন্বন্তরী হেকিম। আমাকে নৌকোয় নেয় না ওই পরান! ঘাটে ফেলে চলে যায়! ওকে এখন নাকখৎ দেওয়াতে চাইলে, আগে শিশুকের তেল মাখাও। মাঝির এত আস্পদ্দা কীসের ? শিশুক ওর বাপের সম্পত্তি নয়।'

নাদানের প্রস্তাবে পরান অবাক হয়ে গেল। নাদানের পেশায় লেগেছে।

পরান চাপা কষ্টে বলল, 'আমি ঘাটের মাঝি। এমন শিশুকের নাচন কোথায় পাবেন! আমি শিশুক ভালোবাসি মিঞাসাহেব। হিফাজতদা আমার কথাটা বোঝেন। অপমান করবেন না। কাছিমের হাট বন্ধ করেন মিঞা। ওই কোঁচ বন্ধ হোক। এ অন্যায়। নদীর মন আমরা বুঝি না, বুঝলে নদীতে ওই গোত্তা কেন হয়, বুঝতাম। পরানের কথা মজলিসে কেউ বুঝতেই চাইল না। সবাই জানে, নদী ওইরকমই হয়েছে, খোদাতালা কিংবা ভগবানের ইচ্ছে। নদীর আবার মন হয় নাকি!

হিফাজত বললেন, 'তুমি পরান পানির ওপরটা ইজারা পেয়েছ, তলাটা পাওনি। মাছ যেমন পানির ফসল, কাছিম-শিশুকও তাই।'

নাদান বললেন, 'বাত ভালো, বাতুনি ভালো,
শিশুকের তেল ভালো।
মালিশে ফায়দা ভালো,
তেল ডালো, উসকো তেল ডালো।'

পরান রুখে উঠল, 'খবরদার, আমার গায়ে শিশুকের তেল দিবেন না। অ্যাই তারক, হাত সরাও। শিশুক স্তন্যপায়ী জীব, মায়া আছে। নাচে, গান করে। রেবাকে ভালোবাসে শিশুমার।'

তারক তফাদার বলল, 'তাহলে মেয়ের সাথে বিহা দিলেই তো পারো।'

পরান জেদের মাথায় বলল, 'তাই দিব। পঞ্চপাণ্ডবের সাথে রেবার দৌপদী-বিয়ে দিব। দিব, দিব, দিব।'

তাই শুনে সারা মজলিস সোরগোল তুলে বেতসের বনে হাওয়ার দোলার মতো দুলে দুলে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল।

তখন কী অসহায় আর বোকা দেখাচ্ছিল পরানকে। সে বোঝাতে পারছিল না—ভগবানের ইচ্ছেই যদি হল, তাহলে সেই ইচ্ছেতেই কাছিম অমন আকার পেয়েছে, শিশুমার ওরকম সুন্দর হয়েছে। জলঘূর্ণিরও মানে আছে। এখানে শিশুমার আনন্দ পায়, কাছিম তার বলবৃদ্ধি করে। চৌমোহনীর কাছিম সবচেয়ে বড় জাতের কাছিম। এরা জলের কর্মী, এদের মারতে নেই। এরাই তো শিশাডিহার ভাঙন রুখে দেয়, পচা লাশকে গোত্তার বাইরে বার করে দেয়। কিন্তু এরা যে বুঝতেই চায় না!

ওই বাইশি-মজলিসে ইমাম বরকত মিঞা, হাইস্কুলের শিক্ষক সনাতন মুকুটি এবং ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট তারাদাস সিকদার উপস্থিত ছিলেন না। ওঁরা থাকলে হয়তো হিফাজত-নাদানে মিলে পরানকে যে-রকম অপমান করলেন, তা হত না।

জোর করে শিশুকের তেল মাখিয়ে দিল ওরা। পরানের সমস্ত শরীর সিরসির করে উঠল। হৃদয় কাঁপতে লাগল। নিজেকে তার অপরাধী মনে হল।

একটা শিশুমারকে মোটা জালে আটকে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে আগুনে ঝলসে তেল বার করার দৃশ্য বড্ড ব্যথিত করে পরানকে। রেবা ওই নিষ্ঠুরতা দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছে।

কাছিম ও শুশুকমারার দল খেপে উঠেছে। তারা মনে করছে, পরান তাদের ব্যবসা নষ্ট করার তাল করেছে। কাছিম কিংবা শুশুক-নিধনে কোনও অন্যায় দেখে না তারা। নাদান মনে করেন, শিশুকের তেল মহা উপকারী বস্তু। মানুষের বাত সারিয়ে তুলতে এর চেয়ে ভালো ওষুধ হয় না। পরানটা পাগল। নইলে জলের মহাভারত নিয়ে কেউ কল্পনা জুড়ে দেয় ? ওকে জোর করে তেল মাখিয়ে সারিয়ে তুলতে হবে, বাতের ব্যাধি সারলে পরানের পাগলামি সেরে যাবে।

অতঃপর রাষ্ট্র হল এই কথা যে, পরান বরপণের টাকা জোগাতে পারবে না ভেবে শুশুকের সঙ্গে রেবার বিয়ে দিতে চাইছে। লোকের কাছে, মস্ত মুখরোচক গল্প হয়ে গেল সেটা। চকশিশার এক গ্রাম্য কবিয়াল পউষের ভারবোল দিলে বেঁধে চড়ুইভাতির উৎসবে।

'ভারবোল ভারবোল ভারবোল বলো ভাই,
পরান মাঝির গল্প শুনে ধন্দ লেগে যায়।
জলে থাকে রুই-কাৎলা, জলে থাকে শুশু,
শুশুর সাথে মেয়ের বিহা দিবেন পরান পশু।'

ভারবোলের কবিয়াল বিদ্যায় কমতি থাকলেও, কবিত্বে কম যায় না। শিশাচকের গ্রাম্য লোকে, তার সংলগ্ন বাইশ গ্রামের মানুষে, শুশুককে 'শুশু' উচ্চারণ করে, পরশুকে বলে 'পশু'। এ একেবারে অকাট্য সাধারণ ভাষা। যারা গ্রামে গিয়েছে, তারাই এই উচ্চারণ শুনেছে।

এই যে বর্ণলোপ, তাই-ই ওই ভারবোলে আশ্চর্য শ্লেষ রচনা করে দিল গ্রাম্য কবিত্বের জোরে। লোকেরা বেজায় আনন্দ পেতে লাগল। এই কবিয়ালের নাম রুস্তম ঘরামি। গেরস্ত ঘরের চালছাওয়া এবং খুঁটি বসানোর কাজ করত। তার ভাগ্নেরা কাছিমমারা। চাল ছাইতে ছাইতে ভারবোল বেঁধে পৌষল্যার 'ভারা' জোগাড়ে বার করে দিল চ্যাঙড়া ছেলেদের।

ধামায় করে পৌষল্যার 'ভারা' নেয় ভারবোলের গায়করা। 'ভারা' বা 'ভার' বলতে ভারবোলের মাধুকরী অথবা তত্ত্ব—তাতে একজন মূল গায়েন গ্রামের কোনও অবৈধ অস্বাভাবিক ঘটনার বয়ান করে। দোহার যারা, তারা মূল গায়েনের গাওয়া গোড়ার দু'-লাইন ধুয়া সমস্বরে ঝাঁকি দিয়ে গেয়ে ওঠে বারংবার। পৌষল্যার ভারা হল ভারবোল শুনে গেরস্ত ধামায় যে চাল-ডাল-সবজি দান করছে, তাই। তা দিয়ে দিনান্তে বনভোজন হবে পউষের সংক্রান্তিতে।

এই ভারবোলে প্রথম দু'টি লাইন ধুয়া।

'ভারবোল ভারবোল ভারবোল শুনো ভাই,
পরান মাঝির কিস্‌সা শুনে ধন্দ লেগে যায়।'

দোহার কখনও ভারবোল 'বলো' কিংবা কখনও 'শুনো' বলে দোহারকি দেয়। গল্পের জায়গায় 'কিসসা' বা 'কেচ্ছা' বসায়। ভারবোলের কথিত 'ধন্দ' সারা ভারবোলের বয়ানে বিবৃত করে মূল গায়েন। ভারবোল মানেই শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ। এক কথায়, ভারবোল হল পউষের ব্যঙ্গগীতি।

ইশকুল যাওয়ার পথে ভারবোল ভেসে এলো রেবার কানে। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পথের উপর। দু'-চোখ ভরে তার কান্না পেয়ে গেল। সে আর ইশকুল যেতে পারল না। বই-খাতা বুকের উপর চেপে ধরে, বাড়ি না-গিয়ে চৌমোহনীর পারঘাটায় বাপের কাছে ফিরে এলো।

পাড়ে নৌকো ভিড়িয়ে বাপ রেবাকে দেখে অবাক হল। বলল, 'কী হয়েছে মা!'

রেবা বলল, 'এ-বচ্ছর রুস্তম ঘরামি কেমন ভারবোল দিয়েছে শুনেছ? শোনো, আমি সত্যি সত্যি শিশুমারকে—ওই পাঁচ ভাইকেই বিয়ে করব বাবা। একটা ব্লু-ডলফিন আশ্চর্য ওই দলে, ওটার নাম আজ থেকে অর্জুন হল বাবা। একটা বেশ কালোকুলো

তাগড়া, ওটার নাম ভীম। একটা ধূসর রঙের, ওটা যুধিষ্ঠির। বাকি দুটো কটাশে, ওরা নকুল-সহদেব। আমি ওই ভারবোলের জবাব দিতে চাই। ওরা তোমাকে জোর করে তেল মাখিয়েছে, তুমি তেলমাখা গায়ে নদীতে নেমে সেদিন হাউমাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠলে। বললে, ওহে পানিমহলের শোভা, ওরে নৃত্যগান, ওগো মায়া, তোমরা এই মাঝিকে ক্ষমা করো। আর ক্ষমা করো কূর্মাধিপতি, হে সৃষ্টির দেবতা, বাঁচাও মানুষকে। তুমিই তো পিঠে করে এই জগৎ-সংসার ধরে আছো।'

ক্লাস নাইনের ছাত্রী রেবা সনাতন স্যারের মুখে নানান পুরাণ-কাহিনী শুনেছে। এই জলেই কূর্ম-সংহিতা আর মহাপ্রকৃতির নৃত্য-সংগীত দেখতে ও শুনতে চাইলে পাওয়া যায় বইকী। পুরাণগল্পে বিশ্বাস নাইবা থাকে যদি, জলের মহাভারত কিন্তু সত্যি। ওই জলের ঘূর্ণিকে কাছিম-শিশুকে মিলেই শান্ত রাখে, শিশাডিহার জানমাল-বসতের গ্যারান্টি ওরাই। মানুষ বুঝল না। পরানকে 'পশু' বলে ব্যঙ্গ করল।

'বেয়ায়কে বাঁচাও পরান, নদীতে কুমির এসেছে মাঝি। আমি ষাটি ধানের পাঁজা দিব, খোদা কসম।' বলে হিফাজত হাত না-ধরে এবার দু'-হাতে পরানের দু'টি পা স্পর্শ করলেন।

সনাতনস্যার হিফাজতকে মাঝির পা ছুঁতে দেখে অবাক হলেন। ভাবলেন, একেই কি বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ ? কোথাও একটা শুশুক দেখা যাচ্ছে না কেন ?

সনাতনস্যার প্রেসিডেন্টকে বললেন, 'দেখেছেন স্যার, কী অদ্ভুত সব কাণ্ড! আমি ভারবোল শুনে খুবই কষ্ট পেয়েছি। গত চৈত্রে পরানের খাপরার বাড়িতে আগুন দিয়েছিল কারা, সেটা আজও জানা যায়নি। পরান কত আর সইবে বলুন তো! অমি কলকাতার ভবানিপুরের লোক বলেই হয়তো চকশিশার সমাজটাকে আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। মানুষ মানুষের ঘরে এইভাবে আগুন দিতে পারে! বয়েস কম, কিন্তু অভিজ্ঞতা কম হল না।'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হওয়ার হরেক জ্বালা ভাই মুকুটি। বেঙের গালে দিই যদি, সাপের গালেও চুমা দিতে হবে। ওরা বাইশি করেছে ফাঁক বুঝে। আমি তখন মধুরকূল গেছি বড়মেয়ের সেজছেলের আকিকা—অর্থাৎ, নামকরণ অনুষ্ঠান, তাইতে। তুমি তখন বড়দিনের ছুটিতে ভবানিপুর। ইমামও নেই শিশাডিহায়, কোথায় গেছে ধর্মের জলসায় নসিহত দিতে—মানে, ধর্মোপদেশ ইত্যাদি ব্যাপারে। তখনই পরানকে অপদস্থ করলে নাদান-হিফাজতে। এটি হীন কাজ হয়েছে মুকুটিসাহেব।'

সনাতন বললেন, 'ভারবোলের দু'টি লাইন বড্ড ধাক্কা দেয় স্যার। 'জলে থাকে রুই-কাৎলা, জলে থাকে শুশু, শুশুর সাথে মেয়ের বিহা দিবেন পরান পশু।' ভাবা যায় ?'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ভারবোলে এই ধরনের হেঁয়ালি তো থাকেই ভায়া। রাষ্ট্র হল, পরান নাকি সত্যি সত্যিই শুশুকের সঙ্গে রেবার বিয়ে দিচ্ছে।'

সনাতন বললেন, 'দিচ্ছেই তো! এই ঘাটেই সেই বিয়ে হবে। পরান নাগাড়ে আমাকে গিয়ে টিচার্সদের মেসে বলে আসছে, স্বপ্নে নাকি নীল রঙের এক মস্ত শিব বলেছে, বিয়ে দে পরান, নইলে ভুগবি। মানুষের মড়ক দিব, নদী মজে যাবে। একশো একটা লাশ ছাড়ব ঘাটে। একশো গো-কঙ্কালে বসে পাঁচশো কাক-শকুনে চেঁচাবে। শিশাডিহাকে নদীর চোয়ালের ঘেরে বসতভিটাসহ খয়রাত দিতে হবে। খালি ঘূর্ণি হবে ভৈরবে, খেয়া বাইবে কোথায় ?'

'তোমাকে এইসব বলেছে পরান!' বিস্ময় প্রকাশ করলেন প্রেসিডেন্ট।

সনাতন বললেন, 'খালি বলেছে নয়, ছ'মাস ধরে বলে আসছে। আজ সকালেও আমার কাছে গেছে। চকের হাটে মধু রুইদাসকে দিয়ে ঢোলসহরৎ করিয়েছে পর্যন্ত। হ্যাঁ স্যার, আমিই সেই বিয়ের পুরুত হব, কড়ার করতে হয়েছে।'

প্রেসিডেন্ট ভয়ানক অবাক হয়ে মূঢ়স্বরে জানতে চাইলেন 'কবে সেই বিয়ে ? আজকেই বুঝি!'

সনাতন বললেন, 'আজই ষাটি পূর্ণিমার রাত্রে। কিন্তু তার আগে এ কী বিপত্তি বলুন তো!'

থ হয়ে ঘূর্ণি আর ভাঙনের দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। গলার স্বর শ্লথ করে বললেন, 'কই, আমাকে তো বলেনি পরান।'

'ঢোলসহরৎ দিয়েছে কিনা!' বললেন সনাতন মুকুটি। এবং যোগ করলেন, 'আলাদা করে কাউকেই বলেনি। সহরতে একটাই ঘোষণা দিয়েছে, বিশ্বাস করে আসবেন।'

প্রেসিডেন্ট দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলে কলকেত্তার কায়দায় বললেন, 'আচ্ছা বেশ। তাহলে আমিও এলেম। কিন্তু ওটা কী!' বলে আঁতকে উঠলেন প্রেসিডেন্ট।

ঘাট এখানে। ওইদিকে শিশাডিহার ভাঙন। জলঘূর্ণির এমন ভয়াল মত্ততা আগে দেখেনি লোকে। আশ্বিনের আঁধি-পীড়িত রাত্রির ভৈরবও এত প্রমত্ত হয় না। প্রকাণ্ড মোষের মতো করে ভোঁস করে জলে পড়ে যাচ্ছে পাড়।

ভৈরব যেন সহস্র সর্পজিহ্বা বার করে মানুষের বসতভিটা লেহন করতে করতে চোয়ালে দাবিয়ে পেটের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। এবং চাইলে মাটিকে চিরে দিতে পারে খালের মতো গহ্বর করে জিভের তাড়নায়।

এই ভয়াবহতাকে ছাপিয়ে জল থেকে দাঁড়া জাগিয়ে মাথা তুলেছে একটা অবিশ্বাস্য দাঁত-বার-করা কুমির, লেজে আছাড়

মেরে জলের প্রতিটি চঞ্চল কণায় সন্ত্রাস জাগিয়ে দিয়েছে। হাঁ হয়ে গেছেন বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট।

'ওরে পরান, এ যে সত্যিই কুমির!' বলে ওঠেন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টবাবু।

পরান বলল, 'আজ্ঞে।'

প্রেসিডেন্ট অল্প কেঁপে উঠে বললেন, 'বাস্তবিক এটি কাল্পনিক নয়, আস্ত।'

পরান বলল, 'এটি বলতে কী, গন্ধে-গন্ধে এসে পড়েছে বাবু। ভাটির টানে গা এলিয়ে মড়ার মতো ভেসে ভেসে বিয়ের নৌকোর পিছু নিলে আশ্চর্য হব না মাস্টার। তরিবত করে স্বাদ খাবে হয়তো।'

'স্বাদ খাবে ? গন্ধ!' চরম বিস্ময়ে কাতর শোনায় প্রেসিডেন্টের গলা।

পরান বলল, 'নাদান হেকিমের গায়ে শিশুকের তেল যে গন্ধ ছাড়ে বাবা। সেইটেই কাল হল। বিয়ের পর বর-কনে সরিষাবাদের ঘাটে নৌকোয় যখন ওঠে, তখনই নাদান এসে ছইয়ের মুখে বসলেন। সেই তখনই ওর গায়ের গন্ধ শিশুকের নাকে লাগে, যেরকম চিতার লাশ-পোড়া মনখারাপ-করা গন্ধ মানুষে পায়, সেইরকম। শিশুকরা ওখান থেকে ছুটে এসে এই গোত্তায় খবর রটায়, নাদান তো শিশুক-তেলে মনখারাপ করে না আজ্ঞে। তেল-মাখা মানুষে নোলায় স্বাদ আনে হয়তো। তাই দেখুন, যা হবার হচ্ছে। রেবা কোঁচ ডরায়, নাদান কুমিরে ডরাবে না! ওই দেখুন।'

কুমির যেন জলের উপর খাড়া হল শিশাডিহার মানুষকে সেলাম দেবার জন্য। তারপর মুখ বাড়াল নাদানের দিকে। তৎক্ষণাৎ নাও ছেড়ে বৈঠা মেরে প্রচণ্ড হয়দরি হাঁক দিয়ে উঠল পরান। রেবা গোত্তার দিকে হাল মেরে নৌকো চালিয়ে দিল। পাড়ের সমস্ত মানুষ বোবা আর ভয়ে-বিস্ময়ে চিত্রার্পিত। পরানের হয়দরি হাঁকে সাহস পেয়ে চেঁচাতে শুরু করল। কুমির মুখ টেনে জলে ডুবে কোথায় হারিয়ে গেল!

এতক্ষণে জলের ভাষা বদলাতে শুরু করে। বাপ-মেয়ে নৌকো নিয়ে গোত্তায় ঢুকে পড়েছে। কোথা থেকে জুটে এলো ওরা। মাঝির হাঁক শুনতে পেয়েছে। শুশুকেরা নাচ দিল। এ-দৃশ্য যেন-বা কোনও অমরাবতীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখছেন সদর হাইস্কুলের শিক্ষক সনাতন মুকুটি। টুপটুপ, ভোঁস-ভোঁস করে দলবেঁধে শিশুমার নেচে নেচে স্রোতের উল্টো পাকে ঘুরছে—যেন এটি বেড়ানাচের মহলা। ওদের অনুসরণে ঘুরছে জলের গহনে অসংখ্য কাছিম।

ঘূর্ণি শান্ত হয়ে এলো। জলের গ্রন্থি খুলে গেল। লাশ এবং গো-কঙ্কাল বেরিয়ে গেল বারি-পরিধির ঘূণ্যাবর্তের কিনারে ভাটির দিকে। তারপর বার হল ষাটিধানের বিয়ের নৌকো। সবাই অতিশয় বিস্ময়ে দেখল, পরানের নৌকোয় নেচে লাফ দিয়ে রেবার কোলে উঠে পড়েছে একটা নীল রঙের ডলফিন। আহ্লাদে গা নড়াচ্ছে শুশু।

ভাদ্রে এমন টলটলে আকাশ যেন দৈবলব্ধ ব্যাপার। মুকুটি দৈব মানেন না। তবু তাঁর মনে হল, প্রকৃতি তার নিজের মতো মানুষকে কিছু জবাব দেয়। কোঁচে বিদ্ধ হলে এ-নদী কাঁদে। এত জল, সবই তখন অশ্রু-মুকুতায় ঝিলমিল করে। ওই ঘূর্ণি মোচড়াতে থাকে পানিমহলের ফরিস্তার হৃদয়।

সন্ধ্যা নামে। আকাশে চাঁদের সভা বসে। চাঁদকে ঘিরে রচে ওঠে রামধনু রঙের পাঁচ-পাঁচটি বৃত্ত। সেই বৃত্তের কিনারে তারারা বসেছে সভাসদের মতো। সেই আকাশের তলায় শুশুকের বিয়ে দিচ্ছেন সনাতন মুকুটি। একটি ফুল দিয়ে সাজানো নৌকোয় বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করছেন তিনি :

'যদিদং হৃদয়ং তবঃ
তদিদং হৃদয়ং মমঃ—'

নৌকো চলেছে উজানে জ্যোৎস্নায় ঝিলিমিলি নদী-দিগন্তের সুদূর পরপারে কোনও মায়াবী স্রোতের ছলাৎছলে। সারা নদীতে নাচ দিয়েছে শুশুকের দল। কাছিমের দল তখনও কাজে ব্যস্ত।

পরান বলল, 'বুঝলেন মাস্টারমশাই। এ না-করলে উপায় ছিল না আজ্ঞে।'

সনাদন মুকুটি জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন ফুল। বিশেষ আশ্চর্য হয়ে পরানের দিকে মুখ তুললেন, 'উপায় ছিল না মানে ?'

পরান বলল, 'পাড়ে দাঁড়িয়ে কত লোকে দেখছে এই জলের বিয়ের ভাসান। কেউ তো আর বলবে না—মেয়েকে আইবুড়ি রেখে হালে খাটাচ্ছি। সমাজের চাপ কীরকম জানেন না। যখন রেবা সিক্সে উঠল, তখন থেকেই চাপ, বে দাও। এই দিগরে আজও একটা ছেলে বি-এ পাশ দেয় নাই। চয়ন সিকদারের নাতি পি-ইউ পাশ না ফেল বোঝা যায় না। হবে একটা কিছু। তাছাড়া আর কই! চকশিশায় সিক্স-সেবেন হলেই মেয়েদের যথেষ্ট হল। এই ডিহিতে একখান জুনিয়ার হাই বিদ্যালয় আছে, আগে এটি ছিল মাইনর। ফলে জুনিয়ার পেরোলেই শাদি। সদরের হাইস্কুলে হালদার গুষ্টির ওই রেবাই নাইন।'

'ও।'

'বুঝলেন স্যার, প্রথমে বেজায় কষ্ট দিলে মনটা। মুখ ফসকে অপমানে আর রাগে বেরিয়ে গেল, শিশুকের সাথেই বিহা দিব মুই। তারপর তো জানেন, রুস্তম ঘরামি পউষল্যার ভারবোলে গ্রামকে-গ্রাম তাতিয়ে ছাড়লে। বন্দনা বললে, মানে রেবার মা, এবার মেয়ের বিয়ের পাঁজায় বার হও মাঝি, মেয়ে তোমার অরক্ষণীয়া হয়েছে।'

'ও।'

'তখন শিবমশাই স্বপ্ন দিলেন, রেবাকে শিশুমারে সমর্পণ করো পরান। নদীতে বিয়ে ভাসাও। ভাসানি বিয়েতে আইবুড়ি

দোষ কাটবে, মেয়ে তোমার মস্ত পাশ দিবে। তারপর পানিপথ ছেড়ে স্থলপথে যেও, মনুষ্যজাতিতে সুন্দর বর পাবে।'

'আজ্ঞে, রেবার যদ্দিন বি-এ পাশ না-হচ্ছে, শিশুক-এর হিফাজতে রইল। আর-কোনও মন্তর-তন্তর লাগবে সার ?'

সনাতন বললেন, 'না। লাগবে না।'

বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট নৌকোয় ছিলেন, মিটকি মিটকি হাসছিলেন।

'তোমার হৃদয় আমার হৃদয়, ব্যস। এবার ডলফিনের হয়ে সিঁদুরটা তুমিই পরিয়ে দাও মুকুটি।'

'সে কী!' রাজ্যের বিস্ময় জমে উঠল সনাতনের মুখে। বললেন, 'আমি তো পুরোহিত প্রেসিডেন্ট স্যার।'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'তুমি তো রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। এটি ভাসানি বিয়ে। বিরাট প্রকৃতির মধ্যে হৃদয়ের বিনিময় হল। অরক্ষণীয়া রক্ষা পেল। আমি সাক্ষী রইলাম। সাত বছর বাদে আসল বিয়েতে বিশ্বাস করে এসো। এটি তো খেলা মাত্র সনাতন। তুমি নবীন। আশা করি বুদ্ধিমান।'

'কিন্তু সিঁদুর দেওয়া কি ঠিক হবে ?' ঘাবড়ে গিয়ে নবীন শিক্ষক সনাতন মুকুটি বলে ওঠেন।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ডলফিনের তো হাত নেই মুকুটি।'

'ও, আচ্ছা। তাই বটে।' বলে সিঁদুরের কৌটো হাতে নিলেন সনাতন। ঢাকনা খুললেন। আঙুলে সিঁদুর নিয়ে বললেন, 'ডলফিনের হয়েই দিচ্ছি স্যার।'

'হ্যাঁ। আমরা সাক্ষী রইলাম। ওই চাঁদ, চাঁদের সভা আর নদীর সমস্ত জীব সাক্ষী।'

প্রকৃতির পড়ুয়ারা এতক্ষণ ধরে একটি মহাশ্চর্য বিয়ের অতি লৌকিক দৃশ্যে মুগ্ধ ছিল।

তারপর সাত বছর কেটে গেছে।

রেবা চকশিশার প্রথম মেয়ে-গ্রাজুয়েট। মন-সের-ছটাক-কাচ্চা-পাই-পয়সার যুগের। বাইশ গ্রামের সে-আমলের একমাত্র উচ্চশিক্ষিতা।

সাত বছর পরে রেবা আর সনাতনের গল্পটা ইচ্ছেমতন লিখে নিতে পারে, যে-কেউ। সিঁথিতে শুশুকের সিঁদুর নিয়েই রেবা পড়াশোনা করেছে। একটি কোঁচ উদ্যত হাত জলের তলে একটি কাছিমকে ওই চৌমোহনীর ঘাটে বিদ্ধ করতে গিয়ে থেমে গেছে। এক মণ ষাটি ধান এখনও পায় নাই পরান।

শোভন মান্না

মাকড়সার জাল থেকে বুলেট প্রুফ গেঞ্জি কিম্বা পোক্ত এয়ারব্যাগ! হ্যাঁ, প্রায় ১৫ বছর গবেষণার পরে অ্যামেরিকার ইয়োমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানীরা এই অষ্টপদী প্রাণীর তৈরি রেশম সুতোর গঠন উদ্ধার করতে পেরেছেন। খুবই হালকা অথচ শক্ত এবং বেশি স্থিতিস্থাপক এই তন্তুকে কিছুদিনের মধ্যেই নাকি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের সুতো ও ক্ষত সারাবার প্লাস্টার বা ঢাকনা হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। মাকড়সার প্রায় ৩৪ হাজার ভিন্ন প্রজাতির তৈরি ছয় ধরনের রেশম সুতোর আণুবীক্ষণিক গঠন পর্যালোচনা করে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন এমনই এক জিনসত্ত্বা, যা একের পর এক ভিন্ন প্রোটিন প্রস্তুত করে। এক বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় এরপর মাকড়সার রেশমগ্রন্থিতে ওই প্রোটিনগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় জুড়ে তৈরি হয় রেশমসুতো—যা একই ওজনের সিন্থেটিক তন্তুর চেয়ে প্রায় তিন গুণ পোক্ত এবং ইস্পাতের পাঁচ গুণ শক্তিশালী। দড়ি, জাল এবং প্যারাস্যুটের কাপড় হিসেবেও এর ব্যবহার হতে পারে। অসুবিধে একটাই। রেশম-মথের মতো সংঘবদ্ধভাবে মাকড়সার চাষ অসম্ভব। কারণ, কলোনিতে নয়, রাজার হালে একা থাকাই এদের পছন্দ। অগত্যা প্রাপ্ত ফর্মুলা থেকে কৃত্রিমভাবে এই 'সিল্ক' প্রস্তুত করার চেষ্টা চলছে। মাকড়সার 'রেশম-জিন'গুলোকে অন্য কোনও জীবের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেখাই যাক-না কী হয়!

আসিমোকে চেনো? জাপানের হন্ডা কোম্পানির তৈরি হেঁটে-এসে-হ্যান্ডশেক করতে পারা রোবট। সোনির ছটফটে রোবট কিউরিওকে দেখেছ? এঁদের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম এমিউ। বৈশিষ্ট্য : রোবট দুনিয়ায় দ্রুততম। উচ্চতা চার ফুট দু' ইঞ্চি। গতিবেগ ঘণ্টায় ছয় কিলোমিটার। অ্যামেরিকান অ্যাসোশিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স-এর বার্ষিক সভায় এদের দুই প্রতিনিধি 'পল' আর

'চুম'-এর সঙ্গে আলাপ হল। এখন অব্দি ১০০ টার মতো বুলি শিখেছে ওরা। বছর ছয়েকের মধ্যেই নাকি ওদেরকে গাইড বা অফিস পরিদর্শক জাতীয় পেশার জন্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে। এমনই দাবি এদের কারিগর জাপানি ইলেকট্রনিক্স সংস্থা হিতাচি-র।

ইটি-দের সঙ্গে কথা বলতে চাও? এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল বা বহির্বিশ্বের প্রাণীদের (অবিশ্যি ওরা যদি সত্যিই থাকে এবং কথাও বলতে পারে, তবেই) সঙ্গে এখন সরাসরি কথা বলা যেতে পারে। অ্যামেরিকা কানেক্টিকাটের একদল খ্যাপাটে এঞ্জিনিয়ার সরাসরি ফোনের মাধ্যমে এই 'এলিয়েন'-এর সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করেছেন। এরজন্য লাগবে মিনিটে-প্রতি প্রায় চার ডলার। ইন্টারনেটে সোজা www.TalkToAliens.com-এর ওয়েবসাইটে ঢোকো এবং তোমার জন্য নির্দিষ্ট নম্বরটা ডায়াল করো। মুহূর্তের মধ্যে ওই কল এক বিশেষ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে আমাদের 'মিল্কি ওয়ে' নক্ষত্রপুঞ্জে বিভিন্ন তারায় প্রেরিত হবে। এরপর তোমার ভাগ্য। যদি কেউ শব্দতরঙ্গের উত্তরে কিছু বলে পাঠায়...

পাখিদের অবিরাম গান গাওয়ার ফুর্তি আসে কোত্থেকে? বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটা গবেষণাপত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, আগের রাত্রের নিরবিচ্ছন্ন ঘুমই গাইয়ে-পাখিদের সংগীতপ্রেরণা। নিউ ইয়র্কের সিটি বিশ্ববিদ্যালযের পক্ষীবিশারদদের মতে, এরা সাধারণত রাত্তিরে ঘুমের স্বপ্নেই পরদিনের গানের রেওয়াজটা সেরে ফেলে। মোটামুটিভাবে বেসুরো অল্পবয়েসি পাখিরা এভাবেই নিজেদের দক্ষ গায়ক-গায়িকা করে তোলে। বিজ্ঞানীরা একদল 'জেব্রা ফিন্চ' পাখির মস্তিস্কে বিশেষ এম আর আই বা ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং-এর মাধ্যমে সরাসরি এই প্রমাণ পেয়েছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের মাথার কিছু অংশ—যেমন, গান গাওয়া সম্পর্কিত মস্তিষ্ক প্রকোষ্ঠগুলো নাকি বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

নামাঙ্কন : সমীর দাশ
অলঙ্করণ : দেবাশিস দেব

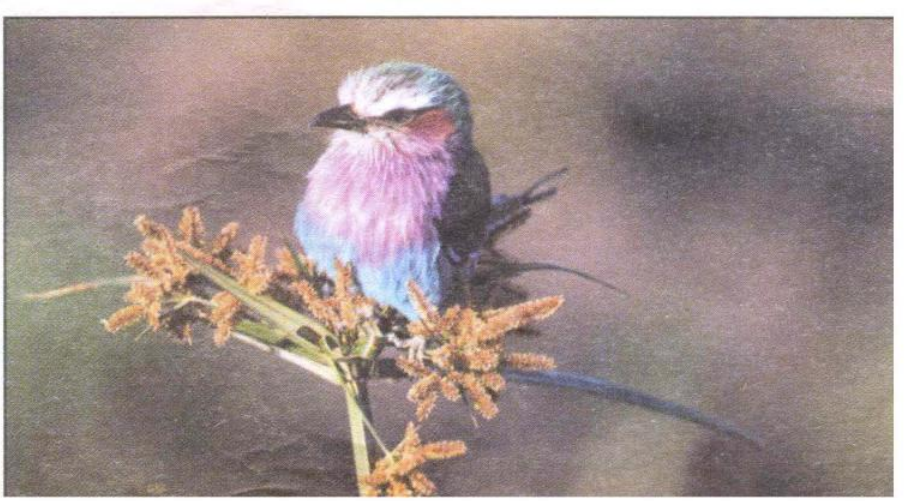

হচ্ছেটা কী!

অনির্বাণ রায়

বলি, হচ্ছেটা কী!
খাতার পাতায় ছবি আঁকি।
কীসের ছবি?
আকাশজোড়া সোনার রবি।

বলি, হচ্ছেটা কী!
খাতার পাতায় ছবি আঁকি।
কীসের ছবি?
আকাশে মেঘ। উড়ছে পাখি।

বলি, হচ্ছেটা কী!
খাতার পাতায় ছবি আঁকি।
ছবি কীসের?
চশমা-চোখে দুই-বিনুনি অঙ্ক-মিসের।

অলঙ্করণ : দেবব্রত ঘোষ

www.acclaris.com

ACCLARIS
FREEDOM TO FOCUS

SCALING NEW HEIGHTS EVERYDAY

ACCLARIS

Eliminates ineffeciencies in back office operations
Lowers administrative cost per transaction
Applies technology to automate entire functions

ACCLARIS provides

Efficient transaction processing environments
Better information at lower cost

ACCLARIS enables

Customers to focus on this core competencies and strategic objectives
Optimal solution for the client

ACCLARIS

A team , focused on personal involvement in maximizing our partners in servicing their clients
Innovation & professionalism for customized solutions

BE A PART OF THIS GROWTH

nettrek 04 - 05

STP II Building, Plot 53,Block DN,Salt Lake City, Kolkata-700 091
Phone : 2367 3457/2367 3458

HQ : 2002 North Lois Avenue, Suite 480, Tampa, Florida 33607, USA.

• Kolkata • Vizag • Tampa • Baltimore

R N I No 12007/64

SANDESH•May 2005
a bengali monthly
for young readers

Rs 10.00

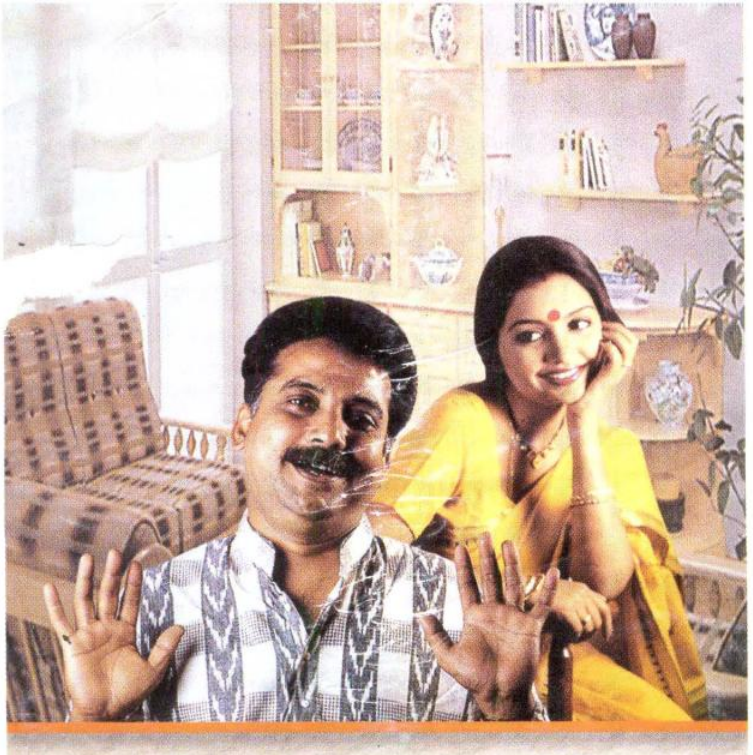

খেয়ে আরাম!

একশ-শতাংশ নিরাপদ, পুরোপুরি
বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রোটিন ও
ভিটামিনের গুনে ভরপুর

Arambagh's chicken

SQF 2000
HACCP
QUALITY ASSURED